ধূপ ধুনুচি ও আরাত্রিক

ধূপ-আরাধনা ও আরতি প্রসঙ্গ

অমিতেন্দু বিশ্বাস

বাঙলার মুখ

সূচিপত্র

ধূপ পুজো

পুজো করবার কথা যদি বলতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে তা তিন গুণের পরিচয় বহন করে। এক হল সত্ত্বগুণ, দুই হল রজোগুণ আর তিন হল তমোগুণ। এই তিন গুণের মাধ্যমেই পুজো করা যেতে পারে ভক্তের ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী। আবার রয়েছে নিষ্কাম পুজো ও সকাম পুজো। এই পুজো পদ্ধতিগুলির নাম যেমন আলাদা, ঠিক এর নামের মতই এই পুজো পদ্ধতিগুলিও কিন্তু আলাদা, এমনকি পুজোর উপকরণগুলিও ভিন্ন। সত্ত্বগুণের পুজো হবে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক উপচারে, সেখানে অতিরিক্ত আয়োজনের কিছু থাকে না। ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প দিয়েই এই পুজো হয়ে থাকে। হোম, জপ, আরতি, ধূপ অর্চন করেও এই সাত্ত্বিক পুজো করা হয়ে থাকে। অনেকের মতে এই পুজো হবে নিরামিষ ভোগ দিয়ে। তবে এই মত সম্পূর্ণ সঠিক নয় কারণ ফল কেটে ভোগ দেওয়াতেই এক প্রকার হিংসার আচরণ বলে ধরা হয়ে থাকে তাই সাত্ত্বিক পুজোতে কোনো কাটাদ্রব্য ভোগ দিলে তা সাত্ত্বিক পুজো হিসাবে গণ্য হবে না। রাজসিক পুজোর ক্ষেত্রে নানা ভাত, নিরামিষ ও আমিষ ব্যঞ্জন দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। রাজসিক পুজোর সব চেয়ে বড়ো উদাহরণ হল দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো হল জাঁকের পুজো তাই এই রাজসিকতা পুজোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা চলে। দুর্গাপুজো বৈষ্ণব মতে হলে নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয় আর শাক্তমতে অনুষ্ঠিত হলে দেওয়া হয় কুলাচার মেনে আমিষ ভোগ। তবে বাড়িতে ধূপ-ধুনো, হোম, আরতি সহযোগেও সাত্ত্বিক ভাবে রাজসিক পুজো করা যেতেই পারে। সাত্ত্বিক পুজোতে ভোগ বা আমান্ন নৈবেদ্যের প্রয়োজনীয়তা সেই অর্থে আবশ্যিক নয়। পুজোর আর একটি অংশ হল তামসিক পুজো যা নিয়ে এখানে বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই কারণ এটি সাত্ত্বিক বা রাজসিকের মতো গৃহীর পুজো নয়, তামসিক পুজোতে বলি আবশ্যিক আচার। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কালীপুজো বা দুর্গাপুজোতে বাড়িতে যে বলি দেওয়া হয় তাহলে সেটি ঠিক কোন্ গুণের পরিচয় বহন করে। সেটিও তমোগুণী পুজোই কিন্তু রাজসিক পুজোর মোড়কে। আসলে দুর্গাপুজো তিন গুণের সমাহারে করা যায়। কেবলমাত্র রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভাবেও করা যায় কিন্তু

কেবল তামসিক ভাবে গৃহস্থের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হতে পারে না। দেবী ভগবতী ত্রিগুণাতীত তাই তিন গুণ দ্বারাই দেবী পুজো করা যায়। যেমন নারায়ণ বা শিব পুজো কিন্তু প্রধানত সাত্ত্বিকভাবে করাই বিধেয়। এবার আসি নিষ্কাম ও সকাম পুজোর কথায়, আসলে এই তিন গুণের পুজো অনেকটাই স্মৃতি শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক মতে চলে তাই সাধারণ ভক্তের কাছে নিষ্কামপুজো ও সকামপুজো অনেক বেশি সহজ-বোধ্য। নিষ্কাম আর সকাম পুজোর মধ্যে যা রয়েছে তা হল কামনার সাথে সাথে উপচারের বিবিধতা। আসলে পুজো তখনি নিষ্কাম হয়ে থাকে যখন তার মধ্যে কোনোরকম কামনার কোনো গন্ধ থাকে না, থাকে কেবল প্রেম-ভক্তি আর ভালোবাসা। নিষ্কাম পুজো করা হয় কেবল মাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্যই কিন্তু সকাম পুজোর মধ্যে থাকে কোনো না কোনো কামনা। এই কামনা যে-কোনো কিছু নিয়েই হতে পারে তবে নিষ্কাম পুজোর মধ্যে এই ধরনের নির্দিষ্ট কামনা থাকে না। সকাম পুজোতে যা আমরা ভগবানকে নিবেদন করি তা আবার আমরা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে থাকি কোনো না কোনো রকম ভাবে। কিন্তু নিষ্কাম পুজোতে ভগবানকে অর্পিত বস্তু আর গ্রহণ করার কোনো বিষয় নেই; কারণ যেমন পুজোতে ভোগ নিবেদনের পর যখন তা আবার প্রসাদী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখন তা সকাম পুজো। নিষ্কাম পুজোতে ধূপ-দীপ অগ্নি মাধ্যম হল মূল উপচার, কারণ এগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে আমরা দেবতাকে অর্পণ করে থাকি আর যা বায়ুর মাধ্যমে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায় আর সঙ্গে সেই ধূপ-দীপ তেজ আমরা গ্রহণ করি আশীর্বাদ রূপে। প্রকৃত অর্থে এই হল নিষ্কাম পুজো, কোনো চাওয়া নেই-পাওয়া নেই কোনো দেনা পাওনা কিছুই নেই। প্রকৃতির উপচারে কেবল সাকারের পুজো। এই নিষ্কাম পুজোর এক অঙ্গ হল এই ধূপ পুজো যা সত্ত্বগুণের পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ নিষ্কাম পুজো এক অর্থে সাত্ত্বিক পুজো আবার সাত্ত্বিক পুজো সেই অর্থে নিষ্কাম পুজোই।

ধূপ পুজো সম্পর্কে বুঝতে হলে আগে আমাদের কিছুটা এই পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা ও খানিকটা প্রাচীন সময়কালে এর গুরুত্ব সম্পর্কেও বুঝতে হবে। কারণ ভোগ দিয়ে পুজো করার চলন সেই অর্থে অনেক আধুনিক এবং এটি পরিবার ও সম্প্রদায় বিশেষে বদলেও যায়, যেমন ব্রাহ্মণরাই অন্নভোগ মূলত দিয়ে থাকে, কায়স্থ হলে লুচি ভোগ, ফল ভোগ, বৈশ্য আর শুদ্ররা সরাসরি ভোগ দেবার অধিকারী নয় ব্রাহ্মণের মাধ্যমে তাঁরা ভোগ জল নিবেদন করতে পারে। এগুলো অনেক পরবর্তী কালের তৈরি যার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আচারব্যবস্থার প্রভাব অনেক বেশি লক্ষণীয় কিন্তু ধূপ পুজো এই সব কিছুর অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল যখন বৈদিক আর্যরা ভারতে তাঁদের সংস্কৃতির ছায়া পর্যন্ত ফেলেনি তখন থেকেই এই ধূপ-ধুনো প্রদীপ সহযোগে পুজো করবার চলন ছিল। বৈদিক আর্য সংস্কৃতি আসার পর যজ্ঞ ও হোম ক্রিয়াদি বাড়তে থাকে

ধীরে ধীরে কিন্তু এই ধূপ-ধুনো জ্বালানোর প্রক্রিয়াটি তাঁরা তখনও বজায় রাখল সমানভাবে এমনকি ওই বনস্পতি ধূপ সামগ্রী তাঁরা তাঁদের হোম ক্রিয়াতেও ব্যবহার করতে শুরু করল। এই 'ধূপহোম' বা 'ধূপহবন' এখনও উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই দেখা যায় সংক্ষিপ্তভাবে হোম করার ক্ষেত্রে। এই ধূপহোম করবার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তাও দরকার হয় না নিজেই করা যায় এটি। কারণ এটি সেই অর্থে লৌকিক হোম যা অগ্নিহোত্র দেবতার আরাধনার উদ্দেশে করা হয়। পুরোহিত প্রথা ভবিষ্যতে কতটা থাকবে বা জাঁকজমক পুজোআচ্চা কতটা থাকবে, সেটা ভাববার বিষয়! তবে নিজে বা স্বতন্ত্র পুজো করার পদ্ধতি যতদিন থাকবে, মানুষের এই সহজ ধূপ-দীপ পুজো সংস্কৃতি কোনো দিনই মুছে যাবে না। আসলে আমাদের পুজো উৎসব এগুলো জাঁক জমকের উপর নয় সরল বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তাই কেবল ষোড়শের পুজো বা আড়ম্বরতা এগুলির চিরন্তন সনাতন ভাবনাকে কখনোই লালন পালন করতে পারে না।

ধূপ পুজো হল ধূপ-ধুনোর পুজো অর্থাৎ ধূপ দিয়েই মূলত পুজো করা। এই ধূপ দিয়ে হোম করা হয়ে থাকে আবার ধূপ দিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে। ধূপ পুজো করতে গেলে কোনো বিশেষ উপচারের দরকার হয় না কারণ ধূপ পুজো হল নিষ্কাম পুজো। আমাদের কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু সকল যখন বৈরাগ্যরূপ অগ্নিতে আমরা জ্বালিয়ে নিজেকে পুজোর জন্য প্রস্তুত করি তখনি তা হয়ে ওঠে আসলে ধূপাগ্নি। এই পুজোর মধ্যে কোনো কামনা থাকে না। কামনা বাসনা ত্যাগ করে আত্মদর্শন এমনকি সাত্ত্বিক কামনা যুক্ত অনাত্মদর্শনের বিলোপই হল ধূপ অর্চনা নিবেদনের তাৎপর্য। অনেকের মতে এটি আসলে সাধনা, আর গৃহীর পক্ষে এই সাধন কর্ম করা সম্ভব নয় সবসময়। হয়তো এটা খানিকটা ঠিক তবে পুরোপুরি নয়। সংসারে থেকেও নিরাসক্ত হয়ে যিনি নিষ্কাম ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর সেবা করতে চান ধূপ অর্চনা সেই গৃহীর ক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। পুজো বা সেবা এখানে গৃহী বা সন্ন্যাসী কোনো বড়ো বিষয় নয় বড়ো কথা হল মনের বৈরাগ্য। এই ধূপ সেবায় মনের বৈরাগ্যকে জাগিয়ে তা অন্তরের তেজের দীপমালায় যখন আরত্রিক করে প্রণিপাত করা হয় তখনই তা সম্পূর্ণ পুজো হয়ে ওঠে। এই ধূপ পুজোর প্রথা অনেক প্রাচীন হলেও হয়তো ব্রাহ্মণ্য সাত-সতেরো উপচারের ভিড়ে তা খানিকটা ম্লান হয়ে গিয়েছে। যদিও পঞ্চোপচার থেকে ষোড়শপচার এবং বাকি অন্য অধিক উপচারের ক্ষেত্রেও ধূপ দিয়ে পুজো করে তা আরতি করে দেবতাকে দেখানোর পদ্ধতি রয়েই গিয়েছে। আসলে এটির স্বতন্ত্র পুজোকে উপচারের পুজোর মধ্যেই যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধূপ পুজো ব্রাহ্মণ্য পুজোর অনেক আগে থেকেই পুজোর একটি বিধি ছিল যা হয়তো পরে সংস্কৃতায়ন হয়েছে বা বলা ভালো ব্রাহ্মণ্য পুজোর সাথে এক হয়ে গিয়েছে।

এখনো অনেক লৌকিক পুজোতে সেই ভাবে বিশেষ নিয়ম আচার কিছুই পালন করা হয় না কিন্তু পালন করা হয় এই ধূপ-ধুনোর লৌকিক হোম ও আরতি। আসলে এই ধূপ আরতি অনেক প্রাচীন, বর্তমানের পঞ্চ নীরাজন ও সপ্ত নীরাজন পদ্ধতিতে আরতিও অনেক পরে শুরু হয়েছে সেই অর্থে। বলা ভালো আরতি নামের থেকেও এই আরাধনা পদ্ধতি অনেক বেশি প্রাচীন। ধূপ হল পঞ্চ তত্ত্বের বায়ুর প্রতীক, দীপ হল অগ্নি বা তেজের প্রতীক। বায়ু অগ্নি আর জল এই তিন তত্ত্বকে প্রাণের মূল তত্ত্ব বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখে থাকি জলপূর্ণ ঘটে গন্ধপুষ্পে পুজো করে ধূপ-ধুনো-প্রদীপ সহযোগে সেবা আরতি করা এই হল লৌকিক পুজোর এমনকি অনেকাংশে বৈদিক পুজোর বিশেষ অঙ্গ। আগমে রাজপুজো, ষোড়শপুজো ও সংক্ষিপ্ত পুজোকে সমান বলা হয়েছে। উপচার ভেদে এটি উত্তম, মধ্যম বা অধম। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো ছাড়াও অনেক জায়গায় বাড়ির লক্ষ্মীপুজোতে ধুনো পোড়ানোর চলন রয়েছে। এই ধুনো পোড়ানো এক অর্থে সেই লৌকিক আরাধনা আবার তা ধূপ হোম করার মতোই ধুনো আহুতি দিয়ে জ্বালানো হয় মঙ্গল কামনায়।

নিষ্কাম পুজো উপচার যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে তার মধ্যে রয়েছে ফুল, ধূপ, চন্দন, দীপ, অক্ষত এগুলি। আবার সকাম পুজোর ক্ষেত্রে রয়েছে ধূপ, দীপ, চন্দন, পুষ্প, আমান্ন বা অন্ন, ভোগ, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি। আমরা পঞ্চোপচার বা ষোড়শপচার পদ্ধতিতে যে পুজো করে থাকি তা আসলে সকাম পুজো। কারণ গৃহস্থের পুজো সকাম হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো ফলের আসায় বা কামনায় আমরা পুজো করি বলেই এটি হল সকাম। সকাম পুজো হল এক অর্থে মূল প্রার্থনার জন্য তাই এক্ষেত্রে যে নৈবেদ্য ভোগ প্রাসাদ বা খাদ্য দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা হয় তা আমরা গ্রহণ করে থাকি এই ভেবে যে এর ফলে আমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হবে। নিষ্কাম পুজোর ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো কামনা থাকে না, তাই ঈশ্বরকে নিবেদন করা ও তাঁর নৈকট্য লাভ করাই সেখানে বড়ো বিষয়। ধূপ পুজো সেই নিষ্কাম পুজোকেই সবসময় ইঙ্গিত করে। ধূপ পুজোর এই সহজ চলন আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি, বেনারসের মতো কিছু কিছু জায়গায় এখনও এর প্রচলন রয়েছে কিন্তু যদিও তা সীমিত। বেনারসের গঙ্গার ঘাটের একেবারেই অনামী এক সাধু এই ধূপ পুজো নিয়ে আমায় যা বলেছিলেন তা থেকেই এই বিষয় নিয়ে আমার অনুসন্ধানের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল বিষয়টি জানার জন্য। তাঁর কথায় ভগবান নিরাকার কিন্তু আমরা ভক্ত তাই তাঁকে নানা সাকার ভাবে নিজের কাছের করে নিয়ে সেবা-পুজো করি। 'ভগবানকে কেবল ভালোবাসলে সাগ্নিক বস্তু যেমন ধূপ-দীপ দিয়ে পুজো করাই হল শ্রেষ্ঠ পুজো আর যদি তার কাছ থেকে মায়াময় কিছু চেয়ে থাকো তবে নানা নিরাগ্নিক উপাচারেও পুজো করা যেতে

পারে। ভক্তের কাছে সাগ্নিক নিরাকার বস্তুর আরাধনাই সঠিক, কারণ তাতে কোনো মায়া থাকে না যার ফলে সাকারেও মনকে একাগ্র করে তোলে ধীরে ধীরে।'

ধূপ হল প্রাণবায়ুর প্রতীক তাই যখন এটি জ্বালিয়ে দেব আরাধনা করা হয়ে থাকে তখন এই বিশ্বাস মনের মধ্যে অনেক বেশি দৃঢ় হয় যে আরাধ্য দেবতা ঘ্রাণে প্রাণে সাকার বিগ্রহে উপস্থিত হয়ে পুজো গ্রহণ করছেন। ধূপ পুজো লৌকিক পুজোর একটি ধারা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ এটি আর্য-পূর্ব সময় থেকেই হয়ে আসছে, তন্ত্রের পূজাপদ্ধতির মধ্যে যার প্রকাশ। এই ধূপ সামগ্রীর ব্যবহার বৈদিক কালে এক অন্য মাত্রা পায় যজ্ঞসামগ্রী হিসাবেও। কিন্তু সকলের পক্ষে যজ্ঞ করা সম্ভব নয় কারণ অনেকে মিলে একত্র ভাবে এই অগ্নিক্রিয়া করা হত তাই গৃহস্থ বাড়িতে অগ্নিক্রিয়া ধীরে ধীরে হোমের রূপ পায়। যজ্ঞ করার নিয়ম হল দাঁড়িয়ে আহুতি প্রদান আর হোমের ক্ষেত্রে বসে আহুতি দিতে হয়। সকল হোম এবং যজ্ঞ ক্রিয়ার সাথে পঞ্চদেব যজ্ঞ ও ধূপ-দীপ আরাধনা ছিলই। তাই এখনও অনেক জায়গায় হোম করে বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হলেও ধূপ-দীপ আরতি করেই তার সমাপন করতে হয়। সকল গৃহস্থের পক্ষে হোম মন্ত্র সহকারে আহুতি দিয়ে করা সম্ভব ছিল না তাই ধীরে ধীরে মন্ত্রহীন ভাবেও প্রতীকী হোমের চলন হতে থাকে ধূপপাত্রে ধূপ-ঘি আহুতি দিয়ে ধূপহোম করে। এটির কোনো মন্ত্র দরকার হয় না বা কোনো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারাও সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয় না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যেমন অনেকে হোম বা যজ্ঞের জন্য উপবীত ধারণ করার কথা বলে থাকেন কিন্তু এই ধূপ হোমের জন্য তার কোনো প্রয়োজন হয় না, এটি যে কেউ করতে পারে; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকেই। এই কারণেই বৈদিক নিত্য অগ্নিহোত্র ও তন্ত্রোক্ত বা লৌকিক ধূপক্রিয়া মূল ভাবনায় মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে।

আরতির ক্ষেত্রেও আগে ধূপ দিয়ে আরতি করে দীপ আরতি ও অন্যান্য উপচার দিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে বা বলা ভালো এটাই সঠিক পদ্ধতি। ধূপ জীবের সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটায় সাথে আশপাশের সমগ্র পরিবেশকেও এক পবিত্র আবহাওয়ায় ভরিয়ে তোলে এক্ষেত্রে মন অনেক বেশি একাগ্র হয়ে ওঠে ঈশ্বরের পাদপদ্মে তাই ধূপ আরতি করে অন্তরের তেজ রূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করা। আসলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাই পুজোর নিয়মকানুন মন্ত্র-তন্ত্র এতো কিছু বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা করার ভাবনাটি থাকে কেবল মাত্র তা সে নিষ্কাম ভাবেই হোক বা সকাম ভাবেই হোক। নিষ্কাম পুজোতে যেমন ধূপের মতো নিজের অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, হিংসাকে পুড়িয়ে দেবতাকে নিবেদন করতে হয় ঠিক তেমনি সকাম পুজোতেও কামনা থাকলেও তা যেন মনকে কেবল কামনাতে কেন্দ্রীভূত না করে রাখে সেই ভূমিকা পালন করে ধূপের সুগন্ধি পবিত্র ধোঁয়া।

হোম প্রজ্জ্বলনের সময় যেমন তাকে হোমাগ্নি বলা হয়ে থাকে ধূপ প্রজ্জ্বলনের সময়ও তাকে বলা হয়ে থাকে ধূপাগ্নি। এই দুই ক্ষেত্রেই আসলে আহুতি প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন হোমের ক্ষেত্রে ঘৃত, সমিধ, বেলপাতা ইত্যাদি; ঠিক ধূপহোমের ক্ষেত্রেও ধূপ, গুগগুল, অগুরু, ঘৃত এই সমস্তগুলি। আসলে দেবপুজোর ক্ষেত্রে এগুলো হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা বহু সময় ধরেই ব্যবহার হয়ে আসছে। যখন বৈদিক হোমের প্রচলন শুরু হয় তখন হোম ক্রিয়ার আহুতির মধ্যেও এই বনস্পতি ঔষধি জাতীয় ধূপ ব্যবহার করা হতে থাকে। সংস্কৃত বহু গ্রন্থে হোমে যে ধূপের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে একত্রে বলা হয়েছে 'ধূপরাজ'। বৈদিক ঋষিদের অনুসরণকারী ব্রাহ্মণরা যেমন নিজেদের ব্রাহ্মণ্য আচারগুলি নিয়ে সচেতন ছিলেন ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ যাতে নিজেও কিছু কিছু পুজো করতে পারে তার জন্যেও বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছিলেন কারণ নিজে পুজো করার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে না থাকলে বা বলা ভালো মানুষ নিজে সংক্ষিপ্ত পুজোটুকু না করতে পারলে হয়তো তাঁরা বড়ো বড়ো হোম বা ক্রিয়া অনুষ্ঠানে কখনই আগ্রহ দেখাবে না এই ভেবেই।

কিন্তু এই ধূপপুজো নিয়েই হঠাৎ এতো কথা কেন বলা হচ্ছে পুজো নিয়ে এতো উপচার থাকতে। এই বিষয়টি নিয়ে আমার বইটি লেখা হত না যদি না দক্ষিণ ভারতের এক পূজারি এই ধূপপুজোর ভাবনাটি সঠিক ভাবে আমায় বোঝাতেন। খুবই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে তিনি বলেছিলেন ধূপপুজো হল পূর্ণাঙ্গ পুজো এবং ত্রিকোণ ভাবে এই পুজো করা যায়। এই ত্রিকোণ ধারার জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ পুজো। কারণ কোনো বস্তু দিয়ে যদি তিনরকম ভাবে পুজো করা যায় তাহলে তা উত্তম থেকে অতি উত্তম এবং তার থেকেও সর্বোত্তম পদ্ধতি হয়ে ওঠে। ধূপপুজোর মধ্যে তাই সমস্ত বিধানের পুজো যেমন ষোড়শ বা পঞ্চ উপচারের এক বিশেষ উপচার রয়েছে তেমনি ধূপের মাধ্যমে ধূপসেবা দেওয়া যেতে পারে আবার আরতি ছাড়া পুজো সম্পূর্ণ হয় না তাই ধূপ-দীপ দিয়েই আরতি করা হয়ে থাকে। তাই অনেক সামগ্রী জোগাড় না করতে পারলেও এই ঘি, ধূপ এগুলির মাধ্যমে সমগ্র পুজো সম্পন্ন করা যেতে পারে। আসলে ধূপপুজোর মধ্যে স্মার্ত, বৈদিক এবং লৌকিক (প্রাচীন তন্ত্র) ক্রিয়া তিনটি বিদ্যমান। যেহেতু ধূপ পুজো হল ক্রিয়া তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব বেশি। তন্ত্র বলতে কোনো তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ নয় তা হল পদ্ধতি; আরো ভালো করে বললে বলতে হয় সর্ব সাধারণের আরাধনা ক্রিয়া বা পদ্ধতি যাকে আগম বলা হয়েছে। আসলে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনেক আগের থেকেই এই ক্রিয়াগুলি সরল সনাতন ধর্ম ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তাই বেদেও এই পদ্ধতিগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদে। দক্ষিণ ভারতে যদি কম সামগ্রীতে পুজো করার প্রয়োজন হয় তবে এই ধূপনৈবেদ্যম করে আরতি করা হয় আবার উত্তর

ভারতেও নবরাত্রি অথবা দীপাবলিতে নিজে পুজো-হোম-আরতি করার ক্ষেত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপে পুজো করে ধূপহোম করে ধূপ-দীপে আরতি করতে দেখা যায়। বাংলায় দুর্গাপুজো বা নানা পুজোতে ধুনো পোড়ানো অনুষ্ঠান লৌকিক ক্রিয়া হলেও তা কিন্তু সেই অর্থে ধূপ আহুতি দেওয়াই। একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেই এই অধ্যায়ের আলোচনার ইতি টানব তা হল ধূপপুজো বলতে কিন্তু ধূপকাঠি জ্বেলে পুজো করার কথা বলা হচ্ছে না। বিধি অনুসারে সঠিক পদ্ধতিতে ধুনুচি ধূপ প্রজ্বলিত করে তা নিবেদন করে সেবা ও আরতি করার বিষয়ই ধূপপুজো। ধূপ আরাধনার জন্য ধুনুচির ধূপাগ্নিই আবশ্যিক।

বৈদিক ধূপ ও আগমোক্ত লৌকিক ধূপ

ভারতে ধূপের ব্যবহার বহুকাল ধরেই চলে আসছে। প্রাচীন সময় অর্থাৎ আর্যপূর্ব সময় থেকেই এই ধূপের ব্যবহার ভারতে হয়ে চলেছে। বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবের আগে পুজোতে মন্ত্রের নয় বরং প্রভাব ছিল তন্ত্রের, তন্ত্রের অর্থ হল ক্রিয়া বা পদ্ধতি। কুল্লুক ভট্ট তাঁর মনুসংহিতার টীকাতে উল্লেখ করেছেন দেবোক্ত শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। আগুনের ব্যবহার মানব সভ্যতার সব চেয়ে বড়ো আবিষ্কার কারণ এর পর থেকেই মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে। আগুনের ব্যবহারের সময়কাল থেকেই দেবতার আরাধনাতে অগ্নির ব্যবহার প্রাধান্য পেতে থাকে আর ধীরে ধীরে ধূপ-দীপের প্রচলনের মাধ্যমে ধূপাগ্নি আর দীপাগ্নি দেবতাকে নিবেদন করা শুরু হয়। ধূপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নানা ভেষজ বনস্পতি বস্তুর ব্যবহার করে উপকার পেতে শুরু করেছিল মানুষ, তাই দেবতার প্রীতির জন্যও সেগুলি নিবেদন করা শুরু হয়। গাছের ছাল, ছোবড়া, নির্যাস, কাঠ এখনও দেব পুজোর ধূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। বর্তমানে অনেক বিকল্প থাকলেও এর কিন্তু প্রকৃত বিকল্প এখনো হয়ে ওঠেনি। এই ধূপের ব্যবহার করে দেবতাদের নিবেদনের মতোই যখন বৈদিক হোম যজ্ঞের প্রচলন হল তখন এই ভেষজ ধূপ-সামগ্রী যা আজ হোমসামগ্রী নামে বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে তা ব্যবহার হতে থাকে। কিন্তু হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলন করে হোমের পাশাপাশি লৌকিক ভাবে ধূপ দীপের ব্যবহার কিছুই কম হয়নি। পরবর্তীতে মন্ত্রহীন ভাবে অনেকেই ধূপপাত্রে ধূপ আহুতি দিয়ে হোম করতে থাকেন এবং পরে বৈদিক মন্ত্রেই তা হতে থাকে। ধূপাগ্নি দিয়ে নীরাজন অর্থাৎ আরতি করে হোমের তিলকের মতোই ধূপশেষ নেবার কথাও বলা হয়েছে বহু পৌরাণিক গ্রন্থে।

দেব অর্চনার ক্ষেত্রে ফুল পাতায় দেবতাকে সাজানো ধূপ-দীপ জ্বেলে আরাধনা বা আরতি করাই ছিল আর্যপূর্ব সমাজের আরাধনার মূল। এর মধ্যে ছিল সাগ্নিক এবং নিরাগ্নিক দুই বিধিই। সাগ্নিকরা মূলত অগ্নির মাধ্যমে অর্চন করতেন। নিরাগ্নিকরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ফুল-পত্র দিয়েই। কারণ এই ভাবেই দেবতার নৈবেদ্য দেওয়া হত

সেই সময়। আমাদের অনেকের ধারণা যে অনার্য সংস্কৃতি ছিল অসভ্য সংস্কৃতি আর আর্য সভ্যতার বিকাশের পরেই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত তৈরি হয়েছে। এখানে বলে রাখি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কিন্তু অনার্য সভ্যতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এরপর ধীরে ধীরে তা বৈদিক আর্য সংস্কৃতির হাত ধরে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু পূজা-পদ্ধতির বেশির ভাগ আচার-উপচার কিন্তু সেই অনার্য সভ্যতারই দান এবং মন্ত্র ও শ্লোকে এই ক্রিয়াগুলোকেই আর্য ঋষিরা পরে বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতাই হল ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা কারণ আর্যদের সভ্যতার বিকাশ অনেক পরে হয়েছিল। এই বিষয়টি অন্য আলোচনার বিষয় যা আমাদের এখানে পুরোপুরি বলা প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক ভাবে এটি বলতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে অনার্য সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতা পূর্বকালীন সময় থেকেই যথেষ্ট সুন্দর ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল কিন্তু তা কেবলমাত্র দ্রাবিড় অনার্য সংস্কৃতি ছিল, না মিশ্র অনার্য সংস্কৃতি তা নিয়ে নানা মত রয়েছে। আমাদের পুজো ক্রিয়ার চলনও সেই সময় থেকেই হয়ে এসেছে। আসলে অনার্য পুজো পদ্ধতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ছিল না, যা যাগ-যজ্ঞ-হোম প্রচলনের খানিক পরে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপেই পুজো বেশি লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের থেকে। হোম পুজোরই একটি অঙ্গ হিসাবে পালিত হতে থাকে। এমনকি অনেক পুজোতে আবার হোম করবার প্রচলন নেই বা না করলেও কোনো সমস্যা নেই ধূপ-দীপ বিশেষ আরতিই যথেষ্ট। বাংলা তথা পূর্ব ভারতে ধুনুচি পাত্রে ধূপ আরতি, দক্ষিণ প্রদেশে ধূপ পঞ্চ নীরাজন এবং উত্তরের বেশ কিছু অংশেই ধূপ ও ঘি সহযোগে ধূপ-হবন করা হয়ে থাকে। এটি কোনো পুরোহিতের সহায়তা ছাড়াই করা হয়ে থাকে। নবরাত্রি দীপাবলিতে এই সংক্ষিপ্ত ধূপহোম করে ধূপদীপ আরতি করা হয়। আসলে হোমের প্রচলন ব্যাপক হলেও তা ধূপ-ধুনোর ব্যবহারকে সেই অর্থে কখনোই ছাপিয়ে যেতে পারেনি এমনকি শাস্ত্রকারেরাও হোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পূর্বে ধূপে দীপে পঞ্চদেবতারও অগ্নি পুজোর কথা বলেছেন। এখানে যদি এক কথায় বলতে হয় তাহলে বলা যায় যে ধূপের ব্যবহার লৌকিক থেকে বৈদিক হয়ে তা বর্তমানে দুটির সংমিশ্রণেই পালিত হয়ে থাকে। তাই আজ দুর্গাপুজোতে বৈদিক মতে হোম অনুষ্ঠান হলেও ধুনো আহুতি দিয়ে ধুনো পোড়ানো ধুনুচি আরতির মতো বিষয়গুলি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

আগম শাস্ত্রে পুজো আরাধনা বিষয়ক তন্ত্র ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। এই তন্ত্র ক্রিয়া কিন্তু বেদের পদ্ধতি প্রচলনের বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে যা সাধারণের পালনীয় আচার পদ্ধতি। যার অনেকটাই বর্ণনা পাওয়া যায় অথর্ব বেদে। আসলে সাধারণের লৌকিক আচারকে বেদও কিন্তু তার বিশ্বকোষে স্থান দিয়েছে কারণ

প্রাগৈতিহাসিক সময়কাল থেকে বৈদিক বা বলা ভালো ব্যাসদেবের রচনাকালের সময়ের মধ্যবর্তী সব আচার নিয়মই বেদের চারটি ভাগে আছে। এর মধ্যে দেবতাদের স্বরূপ আছে স্তুতি আছে যজ্ঞ বিধান আছে সংগীত আছে আবার লৌকিক নিয়ম এবং তন্ত্র আছে। ধূপ প্রদীপ দিয়ে আরতি, ধুনো পোড়ানো বা ধূপ হোম অনার্য সংস্কৃতি থেকে এসেছে এ বিষয়ে আগেই বলেছি কিন্তু যখন বৈদিক ভাবে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার হল তাতে ধূপের নানা বর্ণনা করা হল এবং নানা প্রকারের ধূপ দ্রব্যকে তার উপকারিতা হিসাবেই গুরুত্ব দেওয়া হল। কারণ প্রাচীন সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি নতুন কোনো আচার পদ্ধতি যে চালু করা কঠিন হবে তা হয়তো সে সময়কার বেদ সংরক্ষকরাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হোম বা যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আগে মঙ্গলাচরণের ক্ষেত্রে ধূপ-দীপে সংক্ষিপ্ত পুজো অর্চন ব্যবস্থা চলে আসছে। ধূপ নিবেদনের শ্লোক সম্পর্কে আমরা যদি একটু দেখি তাহলে বিষয়টা আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হবে।

"ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"

অর্থাৎ বনস্পতির দিব্য ভেষজ রস সমৃদ্ধ সুরভিত সুমনোহর গন্ধযুক্ত যে ধূপ তাই আমি আরাধ্যকে গ্রহণ করার জন্য নিবেদন করলাম।

"ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধর্বা সুরভোজনঃ।
ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"

অর্থাৎ বনস্পতি রসে সমৃদ্ধ সুন্দর গন্ধ যা দেবতাদের ভোজনযোগ্য। তাই আমি এই ধূপের মাধ্যমে অর্পণ করছি।

আবার আরেকটি শ্লোকে আরেকটু অন্যরকম ভাবে বলা হচ্ছে—

"বনস্পতি রসোদ্ভুত গন্ধাঢ্যঃ গন্ধ উত্তমম।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"

অর্থাৎ বনস্পতির দিব্য ভেষজ রস সমৃদ্ধ উত্তম সুমনোহর গন্ধযুক্ত ধূপ যা সকল দেবতাদের আঘ্রাণ যোগ্য ও প্রিয়, সেই ধূপই গ্রহণ করার জন্য নিবেদন করলাম।

উপরের শ্লোকগুলিতে আসল বিষয় ভাবনা একেবারেই এক কিন্তু বলবার ধরন আলাদা মাত্র। তবে এখানে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বোঝা প্রয়োজন তা হল প্রত্যেক মন্ত্রে যে ধূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা মূলত বনস্পতির রসযুক্ত সুগন্ধিত গাছের নির্যাস। তাই ধূপকাঠি হিসাবে যে ধূপ আমরা জ্বালিয়ে থাকি তা কিন্তু আসলে দেব পুজোর ধূপের পর্যায়ে ধরা হবে না। এই ভেষজ বনস্পতি রসোদ্ভুত ধূপকেই নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পঞ্চাঙ্গ ধূপ, ষড়ঙ্গ ধূপ, অষ্টাঙ্গ ধূপ, দশাঙ্গ ধূপ, দ্বাদশাঙ্গ ধূপ, ষোড়োশাঙ্গ ধূপ, অষ্টদশাঙ্গ ধূপ। এর মধ্যে

সাধারণ বা গৃহস্থ পুজোর জন্য ষড়ঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ ধূপকে সবচেয়ে উত্তম মনে করা হয়। দেবী পুজোর ক্ষেত্রে বা মহাপুজোর ক্ষেত্রে দশাঙ্গ ধূপ ও হোম ক্রিয়াদির ক্ষেত্রে ষোড়োশাঙ্গ সামগ্রী সব চেয়ে উত্তম মনে করা হয়। অষ্টাঙ্গ ধূপ প্রতিদিন করলে ঘরে লক্ষ্মীর অক্ষয় নিবাস হয় এই বিশ্বাসও অনেক প্রদেশ ও অঞ্চলে প্রচলিত। আমরা এক এক করে ধূপ সামগ্রীগুলি দেখে নেব তবে একটা কথা তার আগে বলা প্রয়োজন যে এই ধূপ সামগ্রীগুলি সবসময় বা প্রতিদিনের পুজোতে জোগাড় করে ব্যবহার করা হয়তো একটু মুশকিলের হতে পারে কিন্তু তবুও যাঁরা বিধি অনুসারে ধূপ আরাধনা করতে ইচ্ছুক হবেন তাঁদের জন্য বলি এক্ষেত্রে কেবল ধুনোর সঙ্গে গুগগুল দিয়েই ধূপ আরতি করা যেতে পারে।

পঞ্চাঙ্গ ধূপ—ধুনো, গুগগুল, চন্দন, অগুরু, ঘি।

ষড়ঙ্গ ধূপ—সর্জরস, গুগগুল, চন্দন, অগুরু, মধু, শর্করা।

অষ্টাঙ্গ ধূপ—কর্পূর, অগুরু, চন্দন, গুগগুল, কেশর, সর্জরস, ঘি, সুগন্ধিত কর্পূর।

দশাঙ্গ ধূপ—মধু, গুড়, ঘৃত, চন্দন, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, গুগগুল, ধুনা, সিদ্ধার্থ।

দ্বাদশাঙ্গ ধূপ—কর্পূর, অগুরু, চন্দন, গুগগুল, কেশর, সর্জরস, ঘি, সুগন্ধিত তেজপাতা, শৈলজ, শর্করা, দারুচিনি, নাগর।

ষোড়োশাঙ্গ ধূপ—কর্পূর, অগুর, চন্দন, গুগগুল, কেশর, সর্জরস, ঘি, সুগন্ধিত তেজপাতা, শৈলজ, দারুচিনি, নাগর, জটামাংসী, গুড়, নখল, নখগন্ধ, সরলকাষ্ঠ।

অষ্টদশাঙ্গ ধূপ—শ্রীখণ্ড, অগুরু, গুগগুল, লোহবান, রাল (ধুনো), দেবদারু, লাক্ষা, গুড়, গোঘৃত, শর্করা, জটামাংসী, নখী, শিলারস, মলযোদ্ভবসার, কর্পূর, পদ্মবীজ, গন্ধসার, পীত চন্দন।

ষোড়োশাঙ্গ এবং তারপর দশাঙ্গ ধূপকেই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে আগম শাস্ত্রে। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' পুরাণে ধূপ মহত্ত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে যজ্ঞ বা হোম যে-কোনো অনুষ্ঠানের আগে ধূপ-দীপ দ্বারা দেব অর্চনা করা আবশ্যক, কারণ যে-কোনো অনুষ্ঠানের আগে ধূপ-দীপ অর্চন করলে পবিত্র ধোঁয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা সহজেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় যা আমাদের কোনো কার্যে সফলতা প্রদান করে। এটি ধর্মীয় বিশ্বাস হলেও এই বিষয়ে আর একটি যুক্তিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে কোনো অনুষ্ঠান যাকে যজ্ঞ বলা হয়ে থাকে তা সে যে-কোনো পুজোই হোক বা সামাজিক অনুষ্ঠান, তা সূচনার সময় ধূপ ও দীপ জ্বালিয়ে অর্চনা করলে ধূপের সুগন্ধির কারণে মন অনেক বেশি একাগ্র ও স্থির হয়ে যায়, তাই কাজটি সুন্দর ও শান্তভাবে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই আনুষ্ঠানিক ধূপের ক্ষেত্রে যে ধূপ দ্রব্য ব্যবহার করা হবে তাকে একত্রে 'ধূপরাজ' বলা হয়ে থাকে। এই ধূপ দ্রব্যগুলো

হল অগুরু, গুগগুল, দেবদারু, ধুনা, মিছরি, এলাচ, দারুচিনি, জটামাংসী, কর্পূর, চন্দন, জাবিত্রী। এই ধূপগুলি সমপরিমাণে নিয়ে সামান্য চূর্ণ করে জ্বালালে তা এক উত্তম সুগন্ধি হয় যা কিন্তু প্রাচীন আয়ুর্বেদ মতে বায়ুকে জীবাণুমুক্ত করে থাকে। এই ধূপ পদ্ধতিকে বায়ুশুদ্ধিও বলা হয়েছে।

ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসাবে যে বস্তুর ব্যবহার করতে হবে সেগুলিও কিন্তু জৈব জ্বালানি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যাতে এই জ্বালানির ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস অধিক পরিমাণে উৎপন্ন না হয় এবং শরীরের হানি না করে। এই কারণে ধূপ বা হোম ক্রিয়ার সময় সেই স্থানে বসে থাকলেও নিঃশ্বাস ও প্রঃশ্বাসের তেমন বিশেষ সমস্যা হয় না যদি না কারুর শ্বাস সম্বন্ধীয় সমস্যা থেকে থাকে। এই জৈব জ্বালানি কেমন হবে সেই বিষয়ে বলা হয়েছে গাছের ছাল, কাঠ, নারকেলের ছোবড়া, গোরুর গোবরের তৈরি ঘুঁটে ইত্যাদি। তবে এর মধ্যে নারিকেলের ছোবড়াকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলা হয়েছে জ্বালানির ক্ষেত্রে কারণ নারকেল উপকারী এবং সনাতন ধর্ম অনুযায়ী পবিত্র ফল ও সর্বত্র এটি পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে একটি কথা না বললেই নয় তা হল অনেক জায়গাতেই ছোবড়া তাড়াতাড়ি জ্বালানোর জন্য কাগজের ব্যবহার করা হয় যা কিন্তু একেবারেই সঠিক নয়। মনে রাখতে হবে যে উনুন ধরানো আর ধূপ জ্বালানো দুটি আলাদা বিষয় এবং এর পিছনে ভাবনা আলাদা কারণ ধূপ দেবতাদের আঘ্রানের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে তাই এটি সবসময় কর্পূর, ঘিয়ের বাতি অথবা পাটকাঠি ব্যবহার করেই জ্বালানো উচিত। কাগজ বা অন্য নানা উপায়ে যে ধূপ জ্বালানো হয়ে থাকে তা কিন্তু কখনোই দেব পুজোর ধূপ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে না, তা দিয়ে বড়োজোর মশা বা পোকামাকড় তাড়ানোর ব্যবস্থা হতে পারে।

ধূপের ব্যবহার যেমন বৈদিক ভাবে করা যেতে পারে আবার লৌকিক ভাবেও করা যেতেই পারে। আসলে লৌকিক ভাবে সাধারণ মানুষই ধূপের ব্যবহার করতেন দেবতার প্রীতির কামনায় কিন্তু এই নিবেদনের কোনো মন্ত্র ছিল না। বৈদিক ধর্ম এই ধূপকেই সংস্কৃত মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতার কাছে নিবেদন করার শিক্ষা দিল। তাই লৌকিক ভাবে মন্ত্রহীন ভাবেও ধূপ নিবেদন করা যেতে পারে আবার বৈদিকভাবে মন্ত্রযুক্ত ভাবেও। ধূপ ক্রিয়া হল আসলে আর্যপূর্ব সময় কালের তান্ত্রিক লৌকিক আচার তাই এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ মন্ত্রহীন ভাবেই এই আচার পালন করতে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন। সঙ্গে এটাও ঠিক যে কোনো পুজোর ক্ষেত্রে যখন ধূপ মন্ত্র বা আরতির সময় ধূপ দীপ মন্ত্র পাঠ করে তা দিয়ে আরতি করা হয় তখন এক ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবারও বলে রাখি তান্ত্রিক লোকাচার বলতে যেন তন্ত্র-মন্ত্র টোটকা বিষয়টিকে কেউ না বোঝেন কারণ প্রকৃত তন্ত্র অর্থে বিধি সম্মত

ক্রিয়াকেই বোঝায়। মন্ত্রহীন ভাবে সাধারণ মানুষের দ্বারা পালিত লৌকিক সংস্কারই ছিল তন্ত্র। লৌকিকভাবে ধূপের ব্যবহার হল ধুনুচিতে নারকেল ছোবড়া, ধুনো, গুগগুল সহযোগে জ্বালিয়ে নেহাৎ পবিত্র জলের ছিটে দিয়ে তা দেবতাকে নিবেদন করে আরতি। বৈদিক ধূপের ক্ষেত্রে ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে তাতে ধুনো, গুগগুল, অগুরু, ঘি শর্করা সহ আহুতি দিয়ে তা নির্দিষ্ট ধূপ মন্ত্রে নিবেদন করে দেবতার গায়ত্রী পাঠ সহ আরাত্রিক করা হবে।

আমরা পৌরাণিক ধূপের কিছু আলোচনা করব। বেদ ও তন্ত্রের সঙ্গে লৌকিক বিধির সর্বোৎকৃষ্ঠ মেলবন্ধন পুরাণের মধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। তাই পুরাণকে প্রাচীন আবার পূর্ণজ্ঞান ভাণ্ডার বলা হয়েছে। এখানে আমরা মূলত বাংলার দুর্গাপুজোর জন্য অধিক পরিচিত দুটি উপপুরাণ কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণে বর্ণিত ধূপের বিষয়ে জানব। আগমের নানা ধূপের প্রকার কালিকাপুরাণে খুবই স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে তাই অনেক স্মার্তকারগণই ধূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালিকাপুরাণের নানান ধূপের উল্লেখ করেছেন কোথাও নাম করেই কোথাও আবার নাম সেভাবে না করেই। কালিকাপুরাণে যক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিষ্ঠ, নির্জ্জর, পরিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ জাতীয় নানা বিশেষ বিশেষ নির্যাস ধূপের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ধূপ আলাদা আলাদা ভাবে অগ্নিধূমের মাধ্যমে সকল দেবতাকে ধূপিত করবার বর্ণনা রয়েছে "ত্রৈতৈর্বিধূপয়েদ্দেবান্ ধূমিভিঃ কৃষ্ণবর্ত্মনা"। নির্যাস রূপ, পরাগ ও কাষ্ঠ গন্ধরূপ ধূপ দেবধূপ। ধূপ আধারে না রেখে এবং আঘ্রান নিয়ে দান করলে তা ফলপ্রদ হয়না এই বিষয়টিও বিস্তৃত বর্ণন হয়েছে। শ্রীচন্দন, সরল, সাল, কৃষ্ণাগুরু, উদয়, সুরথ, স্কন্দী, রক্তবিক্রম, পীতশাল, পরিমল, বিমর্দ্দী, কাশন, নমেরু, দেবদার, বিল্বশাখা, দাড়িম, পারিজাত, হরিচন্দন, বল্লভ প্রভৃতিকে দেব দেবীর প্রীতিকারি বৃক্ষ ধূপ বলা হয়েছে। নিষেধ হিসাবে বলা হয়েছে মজ্জাযুক্ত, পূর্ব আঘ্রান নেওয়া ও অপহরণ করে আনা অর্থাৎ চুরি করে আনা ধূপে দেবী পূজা নিষ্ফল। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও নখী ধূপের সঙ্গে ব্যবহার করে কল্যাণ ধূপে দেবীর আরাধনা করতে। এছাড়া পুষ্প, পত্র ইত্যাদি অভাবে মহৌষধি সর্বৌষধি জাতীয় বনস্পতি বৃক্ষধূপে পুজো করবার বিধান দেওয়া হয়েছে। আসলে লৌকিক ধূপ বা বলা ভালো ভারতের নানা প্রদেশে যে নানা ধরনের বৃক্ষজাতীয় বনস্পতি ধূপ রয়েছে তা পুরাণ আমাদের জন্য সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। এই ধূপের অনেকগুলিই আজ দুষ্প্রাপ্য কিন্তু এখনও এর অনেকগুলি ব্যবহারই দক্ষিণ প্রদেশের মন্দির, বাড়ি ও পূর্বভারতে আনুষ্ঠানিক পুজোতে দেখা যায়। বারাণসী ও গোরক্ষপুরের বেশ কিছু মন্দির ও বিশেষ মতবিশ্বাসী গৃহস্থের গৃহে এর প্রচলন দেখা যাবে। অর্থাৎ ধুনুচিতে ধূপ প্রজ্জ্বলন

যে প্রাচীন তন্ত্র, বৈদিক, পৌরাণিক যুগ থেকে আজও চলছে ধারাবাহিক ভাবে তাতে সাধারণ লৌকিক পরম্পরার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রাচীন তামিল ভাষায় এই ধূপ পুজোকে বা ধূপ আরতিকে ধূপ আরাধনাই বলা হয়েছে। প্রাচীন সময় থেকেই সাধারণ দেবতার বিনোদনের জন্য গাছের ছাল, ছোবড়ার মধ্যে নানা সুগন্ধি নির্যাস পোড়ানো হত যার থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া পাওয়া যেত ও তা দিয়েই দেবতাকে আনন্দ দেওয়া হত, যদি দুর্গাপুজোর ধুনো পোড়ানো বা ধুনুচি আরতির (ধুনুচি নৃত্য) বিষয়ে একটু ভালো করে দেখি তাহলে বলা যায় যে এগুলি লৌকিক সংস্কার। পণ্ডিতদের মতে হোমক্রিয়া প্রচলনের আগে এই ধূপক্রিয়া ছিল একপ্রকার লৌকিক হোমক্রিয়া যা বৈদিক হোমানুষ্ঠানের প্রচলনের পরেও ধূপহোম হিসাবে থেকে গিয়েছে। আসলে ধূপের প্রাকৃতিক ভেষজগুণের কারণে তা যজ্ঞ ও পরে হোম অনুষ্ঠানের ঘৃতাহুতির সঙ্গেই সমানভাবে গৃহীত হয়েছে হোমসামগ্রী হিসাবে। তাই এই ধূপ পুজো পদ্ধতি চাইলে নেহাৎ লৌকিক ভাবে করা যায় মন্ত্রহীন ভাবেই আবার তন্ত্রোক্ত ও বৈদিক ধূপ নিবেদন শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যায়। এক কথায় বললে এই ধূপ আরাধনা হলো একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া যা যে কেউ তাঁর আরাধ্যের উদ্দেশে করতে পারেন কোনো বিধি নিষেধ ছাড়াই।

ধূপ নিবেদন ও আরাধনা

নৈবেদ্য কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, এই কথাটির আসল অর্থ হল নিবেদন অর্থাৎ যে বস্তু দেবতার উদ্দেশে ভক্ত নিবেদন করে থাকেন তাই হল নৈবেদ্য। সাধারণ ধারণায় আমরা যা জানি তা হল যখন আমান্ন বা ভোগান্ন দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয় তখনি তা নৈবেদ্য হয় এবং তা আমরা প্রসাদী রূপে গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। যখন কোনো দ্রব্য সে ধূপ হোক দীপ হোক বা কোনো ভোজ্য বস্তুই হোক না কেন তা নির্দিষ্ট মন্ত্রে বা ক্রিয়ার দ্বারা নিবেদিত হলে নৈবেদ্যই হয় যা সাধারণের কাছে নির্মাল্য প্রসাদ। নৈবেদ্যর আভিধানিক অর্থেও তাই বলা হয়েছে যে দেবসেবার জন্য নিবেদিত কোনো বস্তু। আরাধনা হল আরাধ্যের প্রতি আরাধকের ভালোবাসার নিবেদন। নিবেদন আর আরাধনার মূল ভাবনা একই তা হল বাহ্যিক বা অন্তরের মানসোপচারে অমৃততত্ত্ব নৈবেদ্য প্রদান। নিজের প্রিয় বস্তুকে ভক্ত যখন ঈশ্বরের জন্য প্রিয় মনে করে তা তাকে ক্রিয়ার মাধ্যমে নিবেদন করে তখন তা নৈবেদ্য হয় আর যখন ভক্ত তাঁর অন্তরমনের বস্তুর মাধ্যমে ঈশ্বরের আরতি করে তখন তা আরাধনা হয়। তাই অন্তরের নিবেদন ছাড়া আরাধনা কখনোই সম্পূর্ণতা পায় না।

ধূপ হল বায়ু ও অগ্নির প্রতীক। যদিও ধূপকে প্রধানত বায়ু বা পঞ্চবায়ু তত্ত্ব হিসাবেই বর্ণনা করা হয় কিন্তু ধূপের মধ্যে অগ্নির উপস্থিতিও রয়েছে। ধূপ যেহেতু সুগন্ধ প্রদান করে থাকে তাই এটিকে মাটি তত্ত্বের প্রতীক হিসাবেও অনেকে ধরে থাকেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়েই আমাদের বিশ্ব রচিত তাই এই পাঁচ তত্ত্বেই আরতি করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে অগ্নি, বায়ু, জল হল প্রাণের প্রত্যক্ষ উপাদান। পুজোর ক্ষেত্রে প্রজ্জ্বলিত ধূপকে বায়ুর প্রতীক, দীপমালাকে অগ্নির প্রতীক ও জলপূর্ণ ঘট, জলশঙ্খ অথবা আচমন পাত্রের জলকে জলের প্রতীক মনে করা হয়। এই তিনটি বস্তু ছাড়া কোনো পুজোই সম্পূর্ণ হয় না। জল দ্বারা নিজেকে ও পাত্র শোধন করা হয়ে থাকে ও ধূপ দ্বারা নিজের প্রাণবায়ুকে ও দীপ দ্বারা অন্তরের তেজকে জাগ্রত করে দেব অর্চন করাই হল প্রকৃত পুজো। মানসপুজোর

ক্ষেত্রেও এগুলি মূল উপচার। ধূপের ব্যাখ্যা এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে করা হয়েছে আবার সম্প্রদায় হিসাবেও তা আলাদা আলাদা ভাবনায় নিবেদন করা হয়ে থাকে। তবে ধূপকে মূলত বলা হয়েছে অগ্নিশুদ্ধি, অর্থাৎ ধূপের মধ্যে নিজের অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, ক্রোধ সব জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে জীব বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে যায়। ধূপের পবিত্র সুগন্ধি ধোঁয়াকে তাই বলা হয়েছে ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রতীক। ধূপ আরাধনার মধ্যে রয়েছে মঙ্গল ধূপ, ধূপ নিবেদন, ধূপ নৈবেদ্য, ধূপ হোম, ধূপ অনুবাসন, ধূপারতি এবং ধূপসেবা। এখানে বলে রাখি যে এই প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যেই কোনো না কোনো ভাবে নীরাজন অর্থাৎ আরতি করবার বিষয়টিই দেখতে পাওয়া যাবে। ভোরের মঙ্গল মুহূর্তে যে ধূপ প্রজ্জ্বলন করে দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করে ধূপ-দীপ দ্বারা আরতি করা হয় তাই হল মঙ্গল ধূপ। এখানে হয়তো অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে তাহলে মঙ্গল আরতির সঙ্গে মঙ্গল ধূপের কি পার্থক্য থাকল? পার্থক্য ভাবনায় তেমন কিছুই নেই, আছে পদ্ধতিতে কারণ মঙ্গল আরতি কেবল মাত্র কর্পূর দিয়েও কোথাও কোথাও করা হয়ে থাকে কিন্তু মঙ্গল ধূপ বা মঙ্গল ধূপ আরতি ধুনুচির ধূপেই করতে হবে সঙ্গে বেজোড় সংখ্যার দীপ আরতি। দক্ষিণ ভারতে থাকার সময় এই মঙ্গল ধূপ অনেক বেশি দেখেছি আবার বারাণসীতে এই ধূপের ব্যবহার করে সূর্যোদয়ের সময় আরতি করার প্রচলন দেখেছি। বাংলায় বেশ কিছু বাড়ির মন্দিরেও এই রীতি দেখা যায় তবে তার বেশির ভাগই বাংলার রাঢ় অঞ্চলে এবং নদিয়া জেলাতে। রাজস্থানের বহু জায়গাতেও এই মঙ্গল ধূপ করার রীতি রয়েছে ঘুঁটের আগুনে ঘি, গুড়, ধুনো, গুগগুল দিয়ে।

ধূপ নিবেদন হল পঞ্চ বা ষোড়শ উপচারের সামান্য পুজো নিবেদনের একটি অঙ্গ। এক্ষেত্রে বলা হয় সবসময় পুজোর সব দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হয় না অনেক সময় অন্য প্রদেশে গিয়ে এক প্রদেশের পুজো করতে গিয়েও নানা সামগ্রীর অভাব দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ফুল, চন্দন, অক্ষত (চাল) ও ধূপ সহকারে পুজো সম্পন্ন করে আরতি করা হয়ে থাকে ধূপ-দীপে। আসলে সব সামগ্রী সব জায়গায় পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক আবার অনেক সামগ্রী সংরক্ষণ করে রাখাও সম্ভব নয় কিন্তু ধূপের ক্ষেত্রে এই সমস্যা একেবারেই নেই তাই ধূপ সহকারে পুজো যে-কোনো জায়গায় থেকেই করা যায়। নারকেলের ব্যবহার ভারতের সব প্রদেশেই হয়ে থাকে তাই ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে জ্বালানির সমস্যা তেমন হয় না আর ঘি অন্তত সব জায়গাতেই পুজোর ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তাই অন্যান্য সামগ্রী না পাওয়া গেলেও ধূপ জ্বালিয়ে নিবেদন করে আরতি সব প্রদেশের মানুষই অন্য প্রদেশে থেকেও তাঁদের পুজো অনুষ্ঠানে করে থাকেন। বারাণসীর মানুষ তাঁদের সংক্ষিপ্ত পুজোকে বলে থাকেন 'ধূপ অউর আরতি' অর্থাৎ ধূপ আর আরতির মাধ্যমে পুজো। ধূপহোম আর ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে এটি

মাথায় রাখতে হবে যে তা যেন ধূপকাঠি দিয়ে না হয়, ধুনুচিতে ধুনো-গুগগুলের প্রজ্জ্বলিত ধূপশিখা দিয়ে ধূপ নিবেদন করাই সঠিক দেবধূপ নিবেদন। গুগগুল ছাড়া সঠিক অর্থে দেবধূপ হয় না।

সামগ্রীর অভাবে কেবল ধূপ সামগ্রী দিয়ে পূজার ক্ষেত্রে পুরাণ বলছে "অলাভে পুষ্প জাতানাং পত্রান্যনি নিবেদয়েৎ। পত্রাণামপ্যলাভেতু ওষধীশ্চ নিবেদয়েৎ। ওষধী নামলাভেতু ভক্ত্যা ভবতি পূজিতা।" অর্থাৎ সামগ্রীর অভাবে পুষ্প দিয়ে, পুষ্প না পাওয়ায় পত্র দিয়ে পত্র না পাওয়া গেলে ঔষধী দ্রব্য অর্থাৎ বনস্পতি ধূপ সামগ্রী দিয়েই পুজো সম্পন্ন করা যেতে পারে। কিন্তু এর কোনটিই পাওয়া না গেলে ভক্ত কেবল ভক্তি দিয়েই পুজো করতে পারেন। পত্র-পুষ্প সব সময় উপলব্ধ হয় না তাই মজুত করা বনস্পতি রস সমৃদ্ধ ঔষধী ধূপ দিয়ে অর্চন করা যায় কেবল কিন্তু এর অভাবে প্রাণবায়ু স্বরূপ ভক্তিধূপই দেবতাকে নিবেদন করা যথেষ্ট বলে শাস্ত্রকারদের মত।

ধূপ নিবেদনের পর ধূপ আরাধনার যে বিষয়টি আসে তা হল ধূপহোম। ধূপহোম নিয়ে যদিও আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না তবে বলে রাখি শাস্ত্রে প্রতিদিন যে অগ্নিহোত্রর কথা বলা হয়েছে তা সাধারণের পক্ষে প্রতিদিন করা সম্ভব নয় আবার নানা মতে যজ্ঞ মন্ত্র না জানা থাকলে অগ্নিহোত্র করা যায় না কিন্তু ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন করে ধূপহোম করা যেতে পারে ঘি সহ হোমসামগ্রী বা ধূপসামগ্রী আহুতি দিয়ে। উত্তর ভারতে এটিকে অগ্নিহোত্রর লঘু রূপ বলা হয়ে থাকে যাতে প্রতিদিন যাঁরা অগ্নিবেদিতে হোম ক্রিয়া করতে পারেন না তাঁরাও অগ্নিক্রিয়া করতে পারে। তবে অনেকে এটিকে হোম বলতে নারাজ। তাই এই পদ্ধতিকে 'ধূপহবন' বলা হয়েছে যাকে বাংলায় আমরা 'ধূপহোম' বলতে পারি। উত্তরপ্রদেশ আর রাজস্থানে এই ধূপহোম বেশি প্রচলিত তাই হয়তো বাঙালিরা বলতেই পারেন যে এটি উত্তরভারতীয় রীতি বা পুজো পদ্ধতির অঙ্গ, তাঁদের উদ্দেশে বলি কোনো আচার সংস্কারই বাংলা, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, মারাঠি নয় এইগুলি বৈদিক আর আগম সংস্কার যা প্রাদেশিক লৌকিক আচারে আলাদা আলাদা ভাবে পালিত হয়। দুর্গাপুজোর বা কালীপুজোর ক্ষেত্রে আমরা যে ধুনো পোড়ানো অনুষ্ঠান দেখে থাকি তা কিন্তু এক প্রকার ধূপহোম, যার মধ্যে মাঙ্গলিক লোকবিশ্বাস অনেক বেশি স্পষ্ট। ধুনো আহুতি দিয়ে এই ধুনো পোড়ানো বা ধুনো পুজো লোকাচারের পুজো যা বাংলার পুজোর একটি বিশেষ অঙ্গ, এর মধ্যে মন্ত্রের থেকেও মাঙ্গলিক প্রার্থনা অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উত্তর ভারতে নবরাত্রি পালনের সময় এই ধূপ আহুতি দেওয়া হয় ধুনুচিতে গরুর গোবরের তৈরি ঘুঁটে বা নারকেলের ছোবড়া জ্বালিয়ে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করে।

ধূপ আরতি বা ধূপারতি হল এমন আরাধনা পদ্ধতি যা যে কেউ করতে পারে

এর জন্য কোনো বিধি নিষেধ একেবারেই নেই। আসলে এটি হল সংক্ষিপ্ত আরতি যা ধূপ আর দীপ সহযোগে করা হয়ে থাকে। যেহেতু নাম ধূপারতি তাই ধূপের প্রাধান্য বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এর সঙ্গে দীপ অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ আরতি খুবই জরুরি তবেই তা সম্পূর্ণ আরতি হয় নইলে কিন্তু তা ধূপ দেখানো মাত্র হয়। এই ধূপ নীরাজনের বিষয়ে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং কোন্ ধূপ দ্বারা অর্চন নীরাজন করা হবে সে বিষয়েও বলা হয়েছে। তবে ধূপ আরতি হল মূলত ভক্তের মনের বৈরাগ্যের ও ভালোবাসার প্রদর্শন তাই এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক নয় এটি যে-কোনো ঈশ্বর অনুরাগী মানুষই করতে পারেন তা সে ব্রাহ্মণ হোক বা অব্রাহ্মণ নারী হোক বা পুরুষ।

ধূপ সেবাও ধূপ আরাধনার একটি অংশ কিন্তু তা আমরা পরে আলোচনা করব কারণ সেবা বিষয়টি অন্য ভাবে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই ধূপসেবা, ধূপ নৈবেদ্য, ধূপ অনুবাসন নিয়ে আমরা পরে অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় আসব।

ধূপ অর্চনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে পিতলের ধুনুচি পাত্রেই ধূপ নিবেদন করা উচিত কখনোই হাঁড়ি বা অন্য পাত্রে ধূপ নিবেদন বিধেয় না। অনেকে অবশ্য মাটির পাত্রে ধূপ জ্বালিয়ে থাকেন কিন্তু পিতল ধাতুর সঙ্গে ধূপ পুড়লে যে পজিটিভ উর্জা পাওয়া যায় তা মাটির ক্ষেত্রে সাধারণত হয় না তবে পিতলের পাত্র পাওয়া সম্ভব না হলে মাটির পাত্রে জ্বালানো যেতে পারে। অনেকের মতে মাটির পাত্রে ধূপ নিবেদন গৃহস্থ অর্চনার ক্ষেত্রে সঠিক নয় কারণ তা রাজসিক বা সাত্ত্বিক পুজোর অংশ নয় তামসিক পুজোর অংশ। আসলে গৃহস্থের পুজোর তৈজস মেজে ধুয়ে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তামসিক পুজোয় ব্যবহৃত তৈজস একবারই ব্যবহার করা চলে, তাই হয়তো এই ধরনের বিশ্বাস বা মত প্রচলিত। মোট কথা বাড়ির পুজোর ক্ষেত্রে পিতলের ধূপদান ধূপ আরাধনার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। আরেকটি বিষয় যা কিন্তু ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে আমরা বেশির ভাগই ভুল করে থাকি তা হল তাড়াতাড়ি ছোবড়া জ্বালানোর জন্য কাগজে আগুন জ্বালিয়ে তা ধুনুচির মধ্যে গুঁজে দি যা কিন্তু দেবধূপ জ্বালানোর সঠিক নিয়ম নয়। কর্পূর দিয়ে হোমের মতো করে ধূপাগ্নি জ্বালানোই হল ধূপ প্রজ্জ্বলনের সঠিক পদ্ধতি। তবে কর্পূরের পরিবর্তে ঘি লেপন করা পাটকাঠি দিয়েও ধূপাগ্নি জ্বালানো যায়। আবার ঘিয়ের সলতে দিয়েও কিন্তু জ্বালানো যায়। ভারত সেবা আশ্রমে ঘি সলতের ব্যবহার করে ধুনুচি ধূপ আরতির জন্য জ্বালানো হয়।

ধূপ ও দীপদানকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে কারণ এটি প্রত্যক্ষ দান, বিশ্বাস করা হয় অগ্নিশুদ্ধ এই দুই দ্রব্য দেবতারা সরাসরি গ্রহণ করেন। আসলে মায়া বন্ধন কাটিয়ে মানুষের অন্তরে যে বৈরাগ্যের জাগরণ ঘটে তাই হল আধ্যাত্মিক উন্মোচন।

নিজের অহম, স্বার্থ, লোভ, হিংসা যখন ধূপাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয় তখন নিষ্কাম বৈরাগ্য মানুষের মনে তৈরি হয়। ধূপ নিবেদনের মূল ভাবনা কিন্তু এই বৈরাগ্য থেকেই। আসলে এই নিবেদন হল আমাদের অন্তরের, ধূপ প্রতীকী মাত্র। শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্যান্য মতের পদ্ধতিগত নিয়মাচারে নানা অমিল থাকলেও ধূপ অর্চনার ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো রকম দ্বিমত নেই। এই ধূপ আরাধনা বা ধূপারতির মাধ্যমে বৈষ্ণবরা বিষ্ণু পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি কামনা করেছেন যার ভাব এই প্রকার যে স্বর্গ সুখের মুক্তি নয় কোনো চাহিদা ছাড়াই নারায়ণের পদ সেবা। শাক্ত মতে এই ধূপ আরাধনা হল নিষ্কাম আরাধনা, ধূপ নিবেদন করলে যেমন ধোঁয়া হয়ে সব নিঃশেষ হয়ে কেবল সুগন্ধটুকু থাকে সেই রকম কোনো কিছুই এই জগতে চিরস্থায়ী নয় কেবল মায়ের চরণ দুখানি ছাড়া। ধূপ আরাধনা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জন্য যেমন প্রাসঙ্গিক কারণ প্রথমেই বলেছি এটি বৈরাগ্য ও নিষ্কাম ভক্তির প্রতীক আবার ঈশ্বর লাভ করার ইচ্ছায় ইচ্ছুক গৃহীর জন্যেও। এই নিষ্কাম নিবেদনের অভ্যাসের মাধ্যমে গৃহীও সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর সংসার কর্ম করে ঈশ্বরের আরাধনায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

ধূপাগ্নি, ধূপহোম ও ধুনো পোড়ানো

হোমের অগ্নিকে যেমন হোমাগ্নি বলা হয়ে থাকে ধূপের অগ্নিকে বলা হয় ধূপাগ্নি। এই ধূপাগ্নিকে হোম করার সমান মনে করা হয়েছে। যজ্ঞসূত্র ছাড়া যাঁরা হোম করতে চায় বা যাঁদের শাক্ত মন্ত্র নেওয়া হয়নি কিন্তু দেবীর সামনে হোমক্রিয়া করতে ইচ্ছুক তাঁরা এই ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে ঘৃত ও হোম সামগ্রী বা অষ্টাঙ্গ ধূপ সামগ্রী আহুতি দিতে পারেন। গুগগুল ঘৃত গুড় সহ আহুতি দিয়েও ধূপহোম করা যেতে পারে। শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তশতীতে বলা হয়েছে 'ধূপাগ্নিতর্পণে'[১] দেবীর পুজো করার কথা। এখানে বলে রাখি যে এই ধূপহোম কিন্তু সম্পূর্ণ হোমক্রিয়া এটা কখনোই বলা হচ্ছে না, কিন্তু এটি হোমের অগ্নিক্রিয়ার লঘু রূপ। অনেকের মতে এটিকে ধূপহোম না বলে 'ধূপ অগ্নিহোত্র' বলাই শ্রেয়। কারণ অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে আহুতি প্রদান অগ্নিহোত্র অর্থাৎ অগ্নিতে সমর্পণ বা নিবেদন। হোম হল যজ্ঞের সামান্য রূপ যার সংকল্প থাকে। কিন্তু অগ্নিহোত্র হল নিত্যক্রিয়া যার কোনো বিশেষ সংকল্প থাকে না। অগ্নিহোত্র যে কেউ প্রতিদিন করতে পারেন। চলতি ভাষায় ধূপহোম (ধূপহবন) নামটি বেশি প্রচলিত হয়েছে, আমরাও তাই ধূপহোম বলেই এটির উল্লেখ রাখলাম। নিজের পুজো নিজে করার ক্ষেত্রে ইচ্ছুক ব্যক্তি ধূপহোম বা ধূপ অগ্নিহোত্র করতে পারেন। প্রদেশ ও অঞ্চল বিশেষে এই ধূপহোম ক্রিয়ার পদ্ধতিও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে এবং সামগ্রীও কিছু কম বেশি হয়ে থাকে।

ধূপ হল লৌকিক ধর্মাচারের আরাধনা পদ্ধতি যার মধ্যে তন্ত্রের প্রভাব অধিক। পুজো বা আরাধনার জন্য যে-কোনো ক্রিয়া যখন করা হয় তাই হল তন্ত্র। বেদের উৎপত্তির অনেক আগে থেকেই এই ক্রিয়ার প্রচলন। সাধারণ মানুষের পালনীয় আচারই হল এই তন্ত্র। বৈদিক হোম ক্রিয়া প্রচলনের পরেও কিন্তু বহু জাতি ও উপজাতির মধ্যে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে আরতি করার প্রচলন রয়ে গিয়েছে। আসলে ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে দেবতার আরাধনা স্ব-আরাধনার একটি অংশ ছিল তাই এক এক বস্তু দিয়ে ধূপ জ্বালালে যে যে যজ্ঞ ফল লাভ হবে তাও বলা হয়েছে নানা শাস্ত্রে। যদি এক কথায় বলি তাহলে এখানে এটাই বলতে হবে যে ধূপ ক্রিয়া হল হোম ক্রিয়ার

---

১. 'অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।।'

সংক্ষিপ্ত ও প্রাচীন সংস্করণ। তথাকথিত সাধারণ মানুষও ধূপ নিবেদন, ধূপ হোম, ধূপ আরতি করতে পারেন এই ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে। আসলে আমাদের সমগ্র আচার বিধির মধ্যে এই ধূপ দিয়ে প্রদীপ দিয়ে আরাধনা হল সাধারণ পুজো যা ধর্মবিশ্বাসের ধর্মাচার, বৈদিক আচার প্রচলনের পরেও কিন্তু তা বদলায়নি। বিষয়টি যতটা লৌকিক ভাবে রয়ে গিয়েছে আবার বৈদিক পুজোতেও এক বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছে। এর সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা রয়েছে আগম শাস্ত্রে।

হোম অনুষ্ঠান করতে গেলে প্রাথমিক ভাবে যা যা বস্তুর দরকার হয় তা হল বেল কাঠ (স্থান বিশেষে আমকাঠ বা শমী কাষ্ঠ), পাটকাঠি, ঘি, কর্পূর, হোম সামগ্রী। ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন করতেও প্রয়োজন হয় নারকেল ছোবড়া (স্থান বিশেষে গোময়ের ঘুঁটে), ঘি, ধূপ সামগ্রী। এই হোম সামগ্রী নিয়ে ও ধূপ সামগ্রী নিয়ে হয়তো অনেকের প্রশ্ন জাগতেই পারে, সে বিষয়ে বলে রাখি যে এই দুই সামগ্রী প্রায় সমান অর্থাৎ চাইলে হোম সামগ্রী দিয়েই ধূপ আঘ্রান দেওয়া যেতে পারে আবার ধূপ সামগ্রী দিয়েও হোম করা যেতে পারে। হোমের অগ্নিকে অর্চনাদি করার ক্ষেত্রে ধূপ নিবেদন করে 'এষ ধূপ' বলা হয় আবার 'সোপকরণ আজ্য নৈবেদ্যও' নিবেদিত হয়। অষ্টাঙ্গ ধূপ গৃহস্থ পুজোর জন্য সবচেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। দেবী পুজোর জন্য দশাঙ্গ ধূপ সবচেয়ে উপযুক্ত। তবে অনেক সামগ্রীর অভাবে ধুনা, গুগগুলের ধূপ করা যেতে পারে তার সঙ্গে ঘৃত মিশ্রিত হলে আরো উত্তম হয়ে থাকে। বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই আরাধনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেই ঘৃত মিশ্রিত গুগগুলকে উৎকৃষ্ট দেবধূপ বলা হয়েছে।

বাংলায় যেমন আমরা ধুনো দেওয়া বা ধুনুচি ধূপ বলে থাকি উত্তর ভারতে এই ধূপকে বলা হয় 'হবনধূপ' পূর্বাঞ্চলে যদিও এটি 'ধূপচি ধূপ' নামে পরিচিত। মনে হয় হোমের পরিবর্তে উত্তর ভারতে এই ধূপ করার প্রচলন রয়েছে বলে এটিকে এই প্রকার হবনধূপ নাম দেওয়া হয়েছে। গাছের নানা ছাল এই ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে বহু প্রাচীন সময় থেকেই। দেবদারু গাছের ছাল ও নারকেলের শুকনো খোসা এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত, এর কারণ হিসাবে যে বিশ্বাস তা হল এই যে নারকেল হল 'দেব ফল' অর্থাৎ দেবতার সেবার জন্যই এই বৃক্ষ তাই এর সব কিছুই দেবতার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নারকেল ফলকে লক্ষ্মীনারায়ণের স্বরূপ মনে করা হয় পূর্ব ভারতের অনেক প্রদেশে বিশেষ করে ওড়িশাতে, তাই এই নারকেলের খোসায় অগ্নি সংযোগ করে ধূপ জ্বালালে যে উত্তম ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তা দেবতাদের প্রীতিবর্ধক। বেনারসে যদিও ধূপাগ্নি জ্বালানো হয় গোরুর গোবরের ঘুঁটে ও নারকেলের ছোবড়া দিয়ে, আর এই ধূপ দিয়ে আরতি শুরু করার অর্থ এটাই যে দেবতাদের সুগন্ধ বিলাস অতি প্রিয় তাই তাদের ধূপ আরতির মাধ্যমে আবাহন করা হয় এবং সঙ্গে তাদের আনন্দ-বিনোদন প্রদান করার জন্য সম্পূর্ণ আরতি করা হয়।

এখানে আবারও মনে করিয়ে দিই তা হল কাগজ দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলনে তা দেবতাকে নিবেদনের ধূপাগ্নি কখনোই হয় না।

ধূপহোম করে পুজো করার ক্ষেত্রে হোম সামগ্রী বা ধূপ সামগ্রী স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমেই এই ধূপের অগ্নিতে নিবেদন করতে হয়। পুরোহিত ছাড়া আমরা যখন নিজেই নিজে পুজো করতে চাই অথবা আগ্রহ দেখাই তখন অনেক ক্রিয়া করলেও হোম না করতে পারার এক প্রকার আক্ষেপ থেকে যায়। আসলে অগ্নিহোত্র করে যে-কোনো অনুষ্ঠান করলে তবেই তা সম্পূর্ণ ভাবে দেবতার কাছে নিবেদিত হয় এই হল বৈদিক পুজোর বিশ্বাস আবার তন্ত্র মতেও যদি দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, অগ্নি হল সকল ক্রিয়ার আধার তাই অগ্নিকেই দেবতার কাছে নিবেদন করা হয় ধূপ-দীপের আরতিতে। এ নিয়ে যদিও অনেক জনের অনেক মত থাকতেই পারে কিন্তু অগ্নি ভিন্ন তন্ত্র বা বৈদিক কোনো পুজোই তার সম্পূর্ণতা পায় না তাই হোমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে এই ধূপ হোম করা যেতেই পারে। তবে কেবল মাত্র নিজে পুজো করার ক্ষেত্রেই যে এই ধূপহোম করা হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের আর্থিক কারণে বর্তমানে হয়তো ঘটে-পটে পুজো করতে হয় এবং হোম করার সামর্থ তাঁদের নেই তাই তাঁরা ধুনুচিতে ঘি সহ ধুনো-গুগগুল আরাধ্যকে প্রদান করেন। আবার অনেক মন্দিরে কালীপুজোর ক্ষেত্রে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় না। কারণ শুদ্ধ তন্ত্র মতে পুজোতে নাকি হোমের চলন ছিল না তাই এই হোম ক্রিয়া বাদ রেখেই করা হয় পূজা-অর্চন, এক্ষেত্রেও করা হয় ধূপহোম বা ধূপ পোড়ানো অনুষ্ঠান। আবার পূর্ণ বৈষ্ণব মতে দেবী পুজোতে সন্ধিক্ষণে দীপমালা নয় তার বদলে দেওয়া হয় আটটি ধূপপাত্রে ধূপ আর সঙ্গে ধূপ আহুতি দিয়ে করা হয় ধূপহোম। আসলে সন্ধিপুজোর সময়কাল অনেক সংক্ষিপ্ত হয় তাই সেই সময়ের মধ্যে ষোড়শ পুজো করে হোম করা সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে তাই করা হয় ধূপহোম। তবে এই নিয়ম-গুলো খানিকটা আড়ালেই থেকে গিয়েছে আর বেশির ভাগই গ্রামীণ পারিবারিক পুজোতেই হয়ে চলেছে তাই শহরের পুজোর নিয়ম আচারে সঙ্গে অনেক পত্র-পত্রিকাতে ঠাঁই হয়নি এইগুলির। বারাণসীতে নবরাত্রি উৎসবে নিজে পুজো করার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়, কিন্তু দুর্গাহোম করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেউ হয়তো নবমীর দিন পণ্ডিত দিয়ে সেই হোম অনুষ্ঠান করান তবে প্রতিদিন দুর্গাহোম করা সম্ভব নয় তাই তার বদলে অনেকেই বাড়িতে মায়ের সামনে করেন এই ধূপাগ্নি হোম। উত্তর ভারতে থাকাকালীন এই বিষয় নিয়ে অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করেছি এবং তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য হল সম্পূর্ণ হোম সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয় আর উপবীত না থাকলে হোম করা যায় না তবে অষ্টাঙ্গ ধূপ দিয়ে দেবতার উদ্দেশে আহুতি সহ আরতি করলে তা হোমের সমান ফল দিয়ে থাকে। এবিষয়ে বৈষ্ণব স্মার্ত

গ্রন্থ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও দুর্গাপুজো পদ্ধতি শ্রীশ্রী দুর্গাভক্তিরঙ্গিনীতে বিশেষ ধূপ করাকে 'বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের'[১] সমান বলা হয়েছে। তবে ধূপহোম করতে গেলেও কিন্তু কয়েকটি পদ্ধতি মেনে চলতে হবে সেই বিষয়েই এবার আমরা একটু আলোচনা করব।

ধূপহোম করতে গেলে সবসময় তা পিতলের বা মাটির ধুনুচিতেই করা উচিত। ধূপাগ্নি জ্বালাতে হলে কর্পূর বাসি সলতে জ্বালিয়ে তারপর নারকেল ছোবড়া অথবা গোময় ঘুঁটে দিয়ে তার মধ্যে কিছুটা ঘি দিতে হবে ঠিক যেমন হোমের ক্ষেত্রে ঘি দেওয়া হয়। তবে এখানে যে বিষয়টি বলার তা হলো সরাসরি ঘি দিয়ে আহুতি এই ধূপহোমের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। ধূপ সামগ্রীর মধ্যে ঘি মিশিয়ে তা আহুতি দেয়াই হল এ ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম। যদিও প্রথমে তিনবার ঘি দেওয়া হয় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি বা ধূপাগ্নির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে। ধূপ সামগ্রী যেমন ধুনোর সঙ্গে গুগগুল, চন্দন, অগুরু, গুড়, মধু এক সাথে মিশিয়ে তা দিয়ে আহুতি দেওয়া যায়। অষ্টাঙ্গ ধূপ দিয়েও আহুতি দেওয়া যেতে পারে ঘি সহযোগে। অষ্টাঙ্গ ধূপ কী কী তা আমরা আগেই বলেছি। এমনকি অনেক আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আবার ষোলো রকমের ধূপ দিয়েও এই ধূপহোম করা যেতেই পারে। তবে এই ধূপের নির্মাণের ক্ষেত্রে শাক্ত ভাবনায় ও বৈষ্ণব ভাবনায় কিছু কিছু সামগ্রীর পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। ধূপ আরতি বা ধূপহোম দেবতারা সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করেন বলেই বিশ্বাস কারণ এটি অগ্নি মাধ্যমে হয়। যজুর্বেদের একটি অগ্নি স্তুতি মন্ত্রে যা বৈদিক ধূপ মন্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাতে বলা হয়েছে "ধূরসি ধূর্ব ধূর্বন্তং ধূর্ব তং যোহস্মান্ধূর্বতি তং ধূর্ব যং বয়ং ধূর্বামঃ। দেবানামসি বহ্নিতমংহ সম্নিতমং পপ্রিতমং তুষ্টতমং দেব হূতমম্।।" অর্থাৎ সমস্ত দোষ এবং অন্ধকার নাশকারক হে অগ্নি আপনি সমস্ত অশুভ জিনিসের নাশ করুন। আপনার পবিত্র ধোঁয়ার মাধ্যমেই দেবতারা তাঁদের হব্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করে থাকেন তাই আমি আপনার মাধ্যমেই দেবতাদের আবাহন করছি। মনে হয় প্রথম দিকে এটি যজ্ঞক্রিয়ার বিষয়েই বলা হয়েছে। ধুনুচির (ধূপপাত্র) ধূপ ব্যবহারেও ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন ও নিবেদনের ভাবনার সাদৃশ্যের কারণে পরবর্তীতে বৈদিক ধূপমন্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। ধূপহোম সকলে নাই করতে পারেন কিন্তু ধূপ আরতি নিবেদনের ক্ষেত্রেও এই মন্ত্র প্রাসঙ্গিক।

ধুনুচি ও ধূপাগ্নির ব্যবহার পূর্বভারতের সবচেয়ে লোকপ্রিয় আচারের মধ্যে একটি। এটি প্রথম দিকে লৌকিক ছিল এ বিষয়ে যেমন কোনো সন্দেহ নেই আবার পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তার যখন পূর্বের প্রয়াগ পর্যন্ত হতে থাকে তখন

---

১. "অদ্য বাজপেয়জ্ঞজন্যফলসমফল প্রাপ্তিকাম
ইমমগুরুধূপং ভগবত্যৈ দুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং দদে।"

খানিকটা বৈদিক ভাবে সংস্কৃত হয়ে ওঠে। দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতিতেও এর ব্যবহার এখনও বেশ ভালো রকম রয়েছে কিন্তু যে প্রাণের টান পূর্বভারতের সঙ্গে রয়েছে তা বোধহয় ধূপ-ধুনোর সঙ্গে ভারতের অন্য প্রদেশের তৈরি হয়নি। এখনো পারম্পরিক পিতল ধুনুচি তৈরির ক্ষেত্রে তাই বাংলা এবং বারাণসীর নাম ভারত প্রসিদ্ধ। এই ধূপ দেওয়া, ধূপ আরতি, হোমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বা লৌকিক-বৈদিক আচার হিসাবে ধূপহোম বা ধুনো পোড়ানো বাংলা, গয়া, বারাণসীতেই বেশি দেখা যায়। তবে পশ্চিম উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানেও এই ধূপহোমের বেশ ভালোই প্রচলন রয়েছে।

শুরুতেই বলেছিলাম আবারও বলি তা হল ধূপহোম কিন্তু সম্পূর্ণ হোম কখনোই নয় তা হল সংক্ষিপ্ত অগ্নিক্রিয়া বা লৌকিক অগ্নিহোত্র। মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভাবেও যখন আমরা নিজের পুজো নিজে করতে খানিকটা উদ্যোগী হয়ে থাকি সে ক্ষেত্রে এই ধূপহোম সঠিক ক্রিয়া। যদিও শাস্ত্রীয় ভাবে জ্ঞানার্ণবতন্ত্র দশাঙ্গ ধূপহোম করবার কথা বলছে ("দশাঙ্গধূপহোমেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেত্।।") আসলে আমাদের এই আচার নিয়মানুষ্ঠান ঈশ্বর সেবার উদ্দেশেই যদি করা হয়ে থাকে তবে তা হোম ক্রিয়াই হোক বা ধূপ ক্রিয়া করেই হোক তাতে সমান ফল লাভ অসম্ভব কিছু নয়। কারণ ঈশ্বর তাঁর ভক্তের মনের ভাবনা দেখেন মাত্র, বাহ্যিক উপচার সেখানে অনেক পরের বস্তু। অন্তরের তেজ দ্বারা ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে যখন ধূপহোম করা হয় তখন সেই ধূপের থেকে যে সুগন্ধি উৎপন্ন হয়ে থাকে তা আমাদের মনকে একাগ্র করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিবেদন করতে সহায়তা করে।

ধূপাগ্নি ও ধূপহোম বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়তো সম্পূর্ণ হবে না যদি এখানে বাংলার ধুনো পোড়ানোর কথা নিয়ে কিছু আলোচনা না করি। আসলে এই ধূপহোম বা ধুনো পোড়ানোর মধ্যেই লৌকিক বা নিজে ধূপ আহুতির মধ্য দিয়ে দেবতার উপাসনার এক প্রথা বহু সময় ধরে চলে আসছে। বাংলায় এই প্রথা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে। কারণ দুর্গাপুজো কেবল মাত্র বেদ, পুরাণ মতে হয় না তার সঙ্গে থাকে তন্ত্র মত তার সঙ্গে থাকে লৌকিক নানা আচার নানা পুজো পদ্ধতি। এই লৌকিকতার মধ্যেই কিন্তু এই ধূপহোম বা ধুনো পোড়ানোর বিষয়টি আসে। অনেকের মতে প্রাচীন তন্ত্রেও এই বৈধতা আছে। প্রাচীন তন্ত্র ছিল মূলত অনুষ্ঠানের ক্রিয়া, তন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের যোগ বেশ খানিকটা পরে তাই এই লৌকিক ক্রিয়াগুলিতে তন্ত্রের অনুমোদন থাকাটাই স্বাভাবিক। আসলে ধুনো পোড়ানোর মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি হয়ে থাকে মনের। মনের সব কলুষ কালিমা ধূপের অগ্নিতে আহুতি দিয়ে ধূপের পবিত্র সুগন্ধের মতোই নিজেদেরকেও অগ্নিশুদ্ধি করে নেওয়া।

এই ধুনো পোড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে এবার একটু আলোচনা করা যাক। ধুনো পোড়ানোর দুটি পদ্ধতি আমি দেখেছি। মাটির সরায় পাটকাঠি অথবা কুশ ঘি-এর

বাতি দিয়ে জ্বালিয়ে তার মধ্যে অল্প ঘি দিয়ে ধুনো আহুতি দেওয়া আবার পিতলের সরা বা ছোটো ধুনুচিতে নারকেলের নরম ছোবড়া, কর্পূর ও সামান্য ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে ধুনো আহুতি দিয়ে পোড়ানো। প্রথম পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত এবং এটি মাথায় ও দুই হাতে নিয়ে জ্বালানো হয়ে থাকে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সাধারণত জোড়া হাতে করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিটি বাড়ির মহিলারা করে থাকেন মঙ্গল কামনার মাধ্যমে দ্বিতীয়টির প্রচলন যেখানে বাড়ির ছেলেরা ধুনো পোড়ায় সেখানে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই নিয়ম বাড়ির বউরাই পালন করে থাকেন তবে বহু বাড়িতে ছেলেরাও পালন করে থাকেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতিতেই ধুনো পোড়ানোর চলন রয়েছে। এই ধুনো পোড়ানোর মধ্যে মাঙ্গলিক প্রার্থনার দিকটিই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তবে অবিবাহিত মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে বিধবা বা সধবা এক্ষেত্রে বিচার করা হয় না। যে-কোনো বিবাহিত মহিলাই এই নিয়ম পালন করতে পারেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার অনেক বাড়িতেই কেবল অবিবাহিত ছেলেরাই এই নিয়ম পালন করে থাকেন। বাঙালি ঐতিহ্যের একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং লৌকিক পুজো পদ্ধতি এটি। অনেকে এটিকে শাস্ত্রাচার বলেছেন। যদিও অনেকের মতে এটি লৌকিক বা মানসিক পুজো, আগেই বলেছি যে ধূপহোম লৌকিক ভাবনা থেকেই এসেছে। এটিকে লৌকিক শাস্ত্রাচার বলা হয়তো খুব একটা ভুল হবে না কারণ সংস্কৃত 'শাস্ত্রম' বলতে যে-কোনো আরাধনা বিধি এবং নিয়মকেই বুঝিয়েছে। তাই আমার মতেও এটিকে অশাস্ত্রীয় বলা বোধহয় সম্পূর্ণ সঠিক হবে না। কারণ তথাকথিত শাস্ত্রীয় আচারের আগে কিন্তু কুলাচার, দেশাচার পালনীয় এ কথাই বলা হয়েছে। বহু স্মৃতি গ্রন্থেও এই সমস্ত আচারের কিছু কিছু বর্ণনাও রয়েছে। মনে হয় প্রাক্-আর্য সময়কাল থেকেই লৌকিক বিভিন্ন আচার নিয়ম যা কেবল অভ্যাসেই বেঁচে ছিল তা যখন পরবর্তীতে সংগ্রহীত হতে থাকে স্মৃতি আকারে তখন তা অনেক বেশি ধীরে ধীরে বৈদিক রীতি নীতি পালনের সাথে সাথেই বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন, ধূপহোম বা ধুনো পোড়ানো যাই বলি না কেন তা আজও প্রাকার্য সভ্যতার প্রতীক হয়ে রয়েছে আমাদের পুজো পদ্ধতিতে। তাই হোম, যজ্ঞ অন্য বৈদিক বিধির সঙ্গে এগুলিও সমান ভাবে পালন হয়ে চলেছে। এখানেই হিন্দু সনাতন রীতির সৌন্দর্য যে তা কোনো কিছুকে না ফেলে দিয়ে বরং মিলে মিশে পুজা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। তবে এই রীতিগুলির পালন আমাদেরই করতে হবে নিজের নিজের ঘরে তবেই এগুলি হিন্দুর বা বাঙালির বা ভারতীয় আচার সংস্কৃতি হয়ে দীর্ঘ বছর স্বমহিমায় উজ্জ্বল থাকবে। কারণ সংস্কৃতি বেঁচে থাকে সাধারণের সহজ সরল বিধির মাধ্যমেই কেবল স্মার্তাচার বা শাস্ত্রাচারের মাধ্যমে নয়।

ধূপ আরতি

ধূপ আরতি আরতিরই একটি অঙ্গ কারণ আরতি অনেক রকম ভাবেই করা যেতে পারে। যেমন পঞ্চ উপচারে ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ফুল, পল্লব বা চামর আবার সপ্ত উপচারে ধুনুচি ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, ফুল, পল্লব বা চামর সহকারে। কিন্তু এখানে তাহলে এটা মনে হতেই পারে যে তাহলে আলাদা করে ধূপারতি আবার কী? আসলে যখন ধূপ দিয়েই মূলত আরতি করা হয়ে থাকে তখন তা হয় ধূপ আরতি, এক্ষেত্রে ধুনুচি ধূপ দিয়ে দেবতার আরতি করা হয়ে থাকে মূলত সঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ আরতি। ধূপ আরতির ক্ষেত্রে ধূপ দিয়ে আরতি করার পর প্রদীপ আরতি আবশ্যক নইলে সেটি ধূপ দেখানো হয় আরতি নয়। তবে ধূপ আরতির ক্ষেত্রে আরতি নিবেদন মন্ত্রে প্রধানত ধূপ নিবেদন করেই আরতি শুরু হয় তারপর আচমন পাত্রের জল তিনবার ছিটিয়ে পঞ্চপ্রদীপ নিবেদন করে আরতি করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই তিনটি ক্রমেই ধূপ আরতি হয়ে থাকে, যা হল ধূপ, প্রদীপ, প্রণিপাত বা প্রণাম।

এই ধূপ আরতি হল প্রাচীন আরতি পদ্ধতির মধ্যে একটি। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা তামিলে এটিকে বলা হয়েছে 'ধূপ আরাধনই।' 'আরাধনই' শব্দের অর্থ হল আরতি, আবার দেবভাষা সংস্কৃতে আরতির বর্ণনা রয়েছে 'আরাত্রিক' নামে। ধূপ আরতিকে তাই 'ধূপঃ আরাত্রিক' বলা হয়ে থাকে। দেবতার আরাধনার জন্য এই ধূপ-দীপের ব্যবহার অতি প্রাচীন। অনেক জায়গায় এই ধূপ ও আরতির সঙ্গেই নানা রকম নাম রয়েছে যেমন ধূপসেবা, ধূপবিলাস, ধূপম, ধূপ আরাধনী ইত্যাদি।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের তত্ত্বের প্রতীক হিসাবে ধূপ, দীপ, জল, পুষ্প, চামর নিবেদন করা হয়ে থাকে। বলা হয় তেজ অর্থাৎ অগ্নি এবং মরুৎ অর্থাৎ বায়ু হলো প্রাণের প্রত্যক্ষ প্রতীক। ধূপের মধ্যে অগ্নির অবস্থান আবার বায়ু রূপে তা বায়ুভূতে ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নি হল আমাদের অন্তরের অগ্নি আর এই বায়ু হল আমাদের নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস অর্থাৎ প্রাণবায়ু। পুজোর আগে আমরা যেমন ন্যাসের মাধ্যমে আমাদের প্রাণবায়ুকে দেবতার কাছে নিবেদন করে নিজেকে

পুজো করার উপযুক্ত করে তুলি ঠিক তেমন ভাবেই ধূপ আরতির মধ্যে দিয়েও আমরা আমাদের প্রাণবায়ুকে দেবতার আরাধনায় নিবেদন করি। ধূপের মাধ্যমে দেবতার প্রতি মনকে একাগ্র করে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রতীক পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে দেবতার আরাত্রিক এই হল ধূপ আরতির মূল ভাবার্থ। আসলে আমরা যখন সাধারণ ভাবে মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভাবে পুজো করে থাকি তখন এই ধূপ-দীপ আরতিই আমাদের পুজোর একমাত্র পদ্ধতি হয়ে থাকে যা কোনো বিধি নিষেধ ছাড়া যে কেউ করতে পারেন। আমি এমন অনেককে দেখেছি যাঁদের দিনের মধ্যে চার বার বা তিন বার আরাধ্যের পুজো করার অভ্যাস রয়েছে কিন্তু পুজা সামগ্রী বলতে ধুনুচির ধূপ আর এই পঞ্চপ্রদীপের শিখা মাত্র। আসলে আমাদের সকলের পক্ষে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে বা সব সময় নিবেদন মন্ত্র জেনে পুজো করা সম্ভব হয় না। অতীতে বহু সময় ধরেই পুজো বা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক আরতির অধিকার সাধারণের কাছে না থাকলেও এই ধূপ-দীপ দিয়ে লৌকিক আরতির আচারটুকু তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ এটি সাধারণের প্রাণের পুজো। তাই এই ধূপারতির লৌকিক ধারাটি রেখেই তার সঙ্গে কিছু সংস্কৃত মন্ত্রের যোগ করা হয়েছে মাত্র, যার ফলে তা আরো সম্পূর্ণ পুজা হয়ে উঠেছে। আসলে আরতি যেমন স্বতন্ত্র ক্রিয়া সেই রকম ধূপারতিও কিন্তু স্বতন্ত্র পুজো কারণ এটি স্ব-আরাধনা পদ্ধতি।

আরতির প্রাচীন ধারাটি যদি আমরা একটু দেখি তাহলে কিন্তু তা ছিল এই ধূপারতি কারণ ধূপ এবং দীপ সহকারেই প্রথম দিকে আরতি করা হত। প্রাচীন দ্রাবিড় গ্রন্থে তাই আরতির বর্ণনা রয়েছে ধূপ আরাধনই, দীপ আরাধনই ও ধূপ পঞ্চনীরাজন নামে। ভাগবত ধর্মের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই আরতির ক্রিয়াতেও অনেক পরিবর্তন আসে যা বর্তমান আরতির মধ্যে আমরা দেখে থাকি। তবে শাক্ত আরতি যে বৈষ্ণবদের আরতির ভাবনাকে অনেক পরে গ্রহণ করেছে সেটি যদিও এখনও কিছু দেবী পুজোর আরতি ক্রিয়ায় ভালোই বোঝা যায়। দেবী পুজোতে ধুনো ও তেলের দীপমালা সহকারে আরতি করার প্রচলন এখনও বেশি। ঘি-এর প্রচলন আর্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ব্যাপক ভাবে হয় কিন্তু অনার্য বা দ্রাবিড়রা কিন্তু তাদের দেবকার্যে তেলের ব্যবহারই বেশি করে থাকত। ঘি যেহেতু গোরুর দুগ্ধজাত যা কিনা শ্রীহরির প্রিয় তাই বৈষ্ণবদের পুজোতে ঘৃত প্রদীপই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেবী পুজোতে এখনো সেই প্রাচীন মাতৃ আরাধনার ছাপ দেখা যায় যদিও পরে অনেক বৈষ্ণব পরিবারই দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন ফলে বৈষ্ণব ও শাক্ত অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে। ধূপসেবা করেও আরতি করার প্রচলন রয়েছে ভারতের নানা প্রদেশে। দিনের তিন প্রহরে অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা ধুনো গুগগুল ধূপ দেবতাকে অর্পণ করে ধূপ ও দীপ সহকারে আরতি করাই হল ধূপসেবা। এই ধূপসেবাতে ধূপ এবং

আরতিই প্রধান এক্ষেত্রে কোনো আলাদা ভোগের প্রয়োজন হয় না ধূপ নিবেদনই এখানে নৈবেদ্য। অনেকের মতে গৃহে নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে এই ধূপসেবা ও আরতির মাধ্যমেই সেই পুজো করা যেতে পারে এবং এই ধূপের মাধ্যমেই দেব-দেবীর প্রত্যক্ষতার অনুভূতি হয়ে থাকে। গৃহে ছবি বা ছোটো মূর্তিতে ধূপসেবা আরতি একটি বৈধ প্রক্রিয়া, যা যে কেউ করতে পারেন এবং এটি পুজোর সহজ পদ্ধতি। বারাণসীর বেশ কিছু গৃহস্থ বাড়ি ও মঠে এই নিয়ম খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয় দুটি ধূপপাত্রে। আসলে ধূপের মধ্যে যে সামগ্রী থাকে তা আমাদের পরিবেশকে শুদ্ধ করে আর ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে ধূপসেবা এক প্রকার নৈবেদ্য প্রদান, সঙ্গে আরাত্রিক আরাধনা সম্পূর্ণতা আনে। ধূপসেবা বিষয়ে পরে আমরা সম্পূর্ণ আলোচনা করেছি তাই এখানে বিষয়টি বিস্তারিত করলাম না। ধূপ আরতি করার জন্য বা ধূপসেবা যাই হোক না কখনই রাশিকৃত করে ধূপ দেওয়া উচিত নয় প্রয়োজনীয় ধূপ সামগ্রী প্রদান করাই সঠিক। এবিষয়ে কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে—"রাশীকৃতৈর্ন চৈকত্র তৈর্দ্রব্যৈঃ পরিপূজয়েৎ। তুষাগ্নিবর্ত্তুলাং কৃত্বা ন তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ।।" অর্থাৎ তুষাগ্নির ন্যায় রাশিকৃত ভাবে অনেকমাত্রায় ধূপিত করা উচিত না এবং তা অফলপ্রসূ হয়।

ধূপ আরতির ক্ষেত্রে কিন্তু দিনের কতগুলি সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যখন ধূপ-দীপ সহযোগে ধূপ আরতি করা যাবে। যেমন ভোগ আরতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আরতি করাই বিধেয় সেক্ষেত্রে কেবল মাত্র ধূপ-দীপ সহকারে আরতি করা যায় না। তবে আমরা বাড়ির পুজোর ক্ষেত্রে অনেক সময় বাতাসা-চিনি দিয়ে মধ্যাহ্ন আরতি করে থাকি সেটি কিন্তু আসলে ভোগারতি নয় সেটিকে মধ্যাহ্ন আরতি বলাই অনেক বেশি সঠিক। দিনের প্রথম আরতি অর্থাৎ মঙ্গল আরতি, ধুনুচি ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপ সহকারেই করা যায়। পূর্বাহ্ণ মধ্যে যে পুজো আরতি করা হবে সেটিও ধূপারতির মাধ্যমেই সম্পন্ন করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে স্নানের পরে শৃঙ্গার আরতি করার ক্ষেত্রেও করা হয় ধূপারতি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মায়ের স্নানের পর করা হয় এই ধূপারতি। সন্ধ্যায় ধূপবিলাস অর্থাৎ সন্ধ্যায় আরতির আগে উত্থানের পর ফুলমালায় সেজে ধূপ জ্বালিয়ে এই ধূপারতি করা হয়। এরপর সন্ধ্যার আরতি যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে আরাধকের কাছে। সন্ধ্যায় আরতির ক্ষেত্রে ধূপারতি করা যায় আবার পঞ্চ উপচারেও আরতি করা যায়। এই সময় অনেকেই দুটি ধুনুচিতে ধূপ জ্বালিয়ে তার মধ্যে একটি দিয়ে আরতি করেন সঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ। তবে দুটি ধুনুচি জ্বালাতেই হবে এমন কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম কিন্তু একেবারেই নেই। শয়ান আরতির ক্ষেত্রে অনেকের মত ধূপ আরতি করা উচিত নয় আবার অনেকের মত দেবতার নিদ্রা যাবার আগে যদি গুগগুল চন্দন সুবাস দিয়ে আরতি করা হয় তাহলে তিনি অনেক তৃপ্তির নিদ্রা যান, যেমন সুগন্ধ থেরাপির মধ্যে রাতে শোওয়ার আগে ধূপ সুগন্ধিত করলে অথবা চন্দন

তেল বা গোলাপ জল বালিশে এক ফোঁটা দিলে ভালো ঘুম হয়। তবে বাড়ির নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে আলাদা করে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধান নেই তাই এক্ষেত্রে শয়ান দেওয়া বা শয়ান আরতি আবশ্যক নয়। আসলে আরতি হোক বা কোনো আরাধনা পদ্ধতি তা যখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে তখন আর নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম এই ক্ষেত্রে মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে কারণ তখন ভগবান ভক্তের ভালোবাসার অধীন হয়ে যান, বলা ভালো ভক্তের ভালোবাসায় ভগবান তার হৃদয়ে একাকার হয়ে যান। ধূপারতির ক্ষেত্রেও একই ভাবনা কাজ করে।

আরতি নিয়ে এখানে আলাদা করে আমি আলোচনা করলাম না কারণ তাহলে বিষয়টি অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যায় এবং সঙ্গে কেবল ধূপারতির বিষয়টি সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায়। ধূপ হল দেব অর্চনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক বস্তু তাই এই নিবেদন হল শুদ্ধ নিবেদন। আর যেহেতু আরতিকে সম্পূর্ণ পুজো বলা হয়েছে তাই শুধু ধুনুচি ধূপে আরতি আর বিশুদ্ধ ঘৃত পঞ্চপ্রদীপে আরতি আমাদের পুজোকে সফলতা প্রদান করে। আমরা সাধারণ গৃহস্থরা যাঁরা অনেক কিছু পুঁথি না পড়েও অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন না করেও গৃহের দেবতাকে বা দেবীকে ভালোবাসার বন্ধনে আর উপচারে পুজো আরতি করতে চাই সে ক্ষেত্রে ধূপারতি হল সবচেয়ে সহজ আর সরল পদ্ধতি। শাস্ত্রীয় পুজোতে যাঁদের অধিকার ছিল না তাঁরাও যেমন ধূপসেবা ধূপ আরতি করেছেন আবার শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও এই নিয়ম পালন করতে হয়েছে। আসলে আমরা গৃহীরা প্রতিদিনের পুজোতে অনেক কারণেই পঞ্চ উপচারে আরতি করে উঠতে পারি না তাই আমাদের কাছে ধূপারতি অনেক প্রাণের অনেক কাছের অনেক বেশি নিজের। ধূপারতির মধ্যে দিয়ে তাই বৈদিক আর লৌকিক আচার মিলেমিশে গিয়েছে। তবে এখানে আরো একবার বলি ধূপকাঠি তা সে যত বড়ো সংস্থার ছাপওয়ালাই হোক না কেন তা দিয়ে কিন্তু কখনোই ধূপারতি করা সঠিক পদ্ধতি নয়। এক্ষেত্রে সবসময় ধুনুচি ধূপ ব্যবহার আবশ্যক।

বৈষ্ণব ধূপ, দুর্গা ধূপ ও শিব ধূপ

ধূপের সুগন্ধি সকল দেবতাদেরই প্রিয় এবং অনেক দ্রব্যের অভাবে কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত পুজো করে অর্থাৎ গন্ধপুষ্পে, অক্ষত, ধূপ নিবেদন করে আরতি করলেও সম্পূর্ণ পুজো করা যায়। প্রত্যেক দেবতারই আলাদা আলাদা ফুলের মতোই আলাদা আলাদা ধূপের সুগন্ধি প্রিয়। ধুনো এবং গুগগুল যদিও সকল দেবতাকেই অর্পণ করা চলে। বৈষ্ণব ধূপ হল যা দ্বারা শ্রীহরি বিষ্ণুর অর্চনা করা যায়। আগে শালগ্রাম শিলার পুজো অনেক বেশি প্রচলিত ছিল এবং বেশিরভাগই ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁর সেবা পুজো করার বিধান ছিল একপ্রকার, অন্য দেব দেবীর পুজো নিজে করা হলেও শালগ্রাম শিলার সেবা নিজে করার বিধান ছিল না। এ বিষয়ে যদিও অনেকের মত যে অব্রাহ্মণ পুরুষেরাও শালগ্রাম শিলার সেবা করতেন কিন্তু দূর থেকেই তুলসী চন্দন নিবেদন করতেন আর ধূপ-দীপ দেখাতেন বা আরতি করতেন। আসলে ধূপপুজো সকলের জন্য, এর মধ্যে কোনো নিষেধ নেই ঠিক যেমন আরতি যে কেউ করতেই পারেন তার জন্য ব্রাহ্মণ বা মন্ত্র দীক্ষার কোনো প্রয়োজন একেবারেই নেই। বর্তমানে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করি পটে অথবা পিতলের মূর্তিতে তাই সাক্ষাৎ স্পর্শ নেই। শালগ্রাম হলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ তাই তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন হয় না। নবদ্বীপের এক মহাপ্রভুর সেবারত বৈষ্ণব পূজারির কাছে শুনেছিলাম যে 'আমরা ভাবি ভগবান ভোগ প্রাসাদ দিলে বেশি খুশি হন কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। নিশ্চয়ই ভোগের মাধ্যমে ভক্তরা প্রসাদ পেয়ে থাকেন যাতে তাঁদের ক্ষুধা নিবারণ হয় কিন্তু দেবসেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল গন্ধ, পুষ্প, ধূপ কারণ এই বস্তুগুলি দেবতা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করে থাকেন ভোগ অন্ন, নৈবেদ্য, ফলমূল তিনি ভক্তদের জন্য প্রাসাদ করে দেন মাত্র, যদিও মাধবের সেবায় নিবেদিত পুষ্প, ধূপও নির্মাল্য প্রসাদী স্বরূপ।

বিষ্ণুপুজোর জন্য যখন অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হয়ে থাকে তা হয় বৈষ্ণবাগ্নি। সাধারণ পূজক ধূপাগ্নির মাধ্যমে এই অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে শ্রীহরির আরাধনা করেন। এখানে হয়তো মনে হতেই পারে যে ধূপকেই কেন এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দীপও অগ্নিস্বরূপ

তাই দীপ জ্বালালেই হয়ে যায়। দীপ অবশ্যই অগ্নিস্বরূপ এবং তেজ স্বরূপ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ধূপ হল অগ্নি ও বায়ুর যুগ্ম প্রতীক। আবার ধূপ যেহেতু গন্ধের প্রতীক তাই এটিকে ক্ষিতি তত্ত্ব হিসাবেও দেখা হয়। তাই যখন আমরা ধুনুচির মধ্যে ধূপ প্রজ্জ্বলন করি তখন তা ধূপ যজ্ঞের সমান। অর্থাৎ আমরা হয়তো সকলে হোম করে উঠতে পারি না কিন্তু এই ভাবেই সংক্ষিপ্ত হোম সমতুল্য অনুষ্ঠান করে দেবতার প্রীতি লাভ করা যায়।

শ্রীহরি বিষ্ণুর ধূপ প্রদান সম্পর্কে 'শ্রীশ্রী হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে "ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং। ধূপশেষং ততো ভক্তা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ।।" অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্দির সকল প্রকারে ধূপিত করে তারপরে ভক্তি সহকারে নিজে ধূপশেষ সেবা করবেন। ধূপ প্রদান সম্পর্কে প্রহ্লাদ সংহিতাতেও বলা হয়েছে "যিনি তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা প্রভুকে ধূপ অর্পণ করেন, তাঁহার শতযজ্ঞ সদৃশ পুণ্য লাভ হয় এবং তিনি দশসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"। বৈষ্ণবদের মতে যেমন দেবী পুজোর ক্ষেত্রে বিল্ব কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা ধূপ বা হোম করা সবচেয়ে উত্তম এই 'তুলসিকাষ্ঠবহ্নিনা' দ্বারা অর্থাৎ তুলসী কাঠের অগ্নি দিয়ে ধূপ ও সাথে আরাত্রিক করলেই শ্রীহরির অর্চন সম্পূর্ণ করা হয়ে যায়। কারণ বিষ্ণুপুজোতে বিশেষ আড়ম্বরতার কোনো প্রয়োজন হয় না। এই ধূপ আরাত্রিক করার বিষয় সম্পর্কেও 'শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে "ততঃ সমর্প যদ্ধূপং ঘণ্টা বাদ্যজয়স্বনৈঃ। ধূপস্থানাং সমভ্যর্চ্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ।।" অর্থাৎ বাম হাতের তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে ধূপভাণ্ড পুজো করে তারপরে ঘণ্টাবাদন ও জয়ধ্বনি সহকারে প্রভুকে ধূপ প্রদান করতে হয়। বামনপুরাণ অনুসারে জটামাংসী, কণ (একপ্রকার গুগগুল), দারু, সিহ্লক, অগরু, শর্করা, নখী ও জাতীফল দ্বারা নির্মিত ধূপ বিষ্ণুর প্রীতিকর। মূলাগমে লেখা আছে গুগগুল, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন সকল দ্রব্য উত্তম কাষ্ঠাঙ্গারে ফেলে উৎকৃষ্ট ধূপ রচনা করতে হয় যা ধূপ নিবেদন ও আরতির জন্য ব্যবহার্য।

বিষ্ণু আরাধনার ক্ষেত্রে সাধারণত স্মার্ত ও গোস্বামী এই দুটি মতেরই প্রাধান্য সর্বাধিক। আরো বেশ কিছু মতেও বিষ্ণুপুজো করা হয়ে থাকে যেমন বৈষ্ণবাগম। তবে যদি বৈষ্ণব পুজোর মূল অর্থাৎ গোস্বামী মতে বিষ্ণু পুজোর কথা ধরে থাকি তাহলে দেখব যে যজ্ঞ এবং ধূপপ্রদানকে সেখানে আলাদা করে দেখা হয়নি। কারণ বৈষ্ণব সমাজে বিষ্ণু পুজোর ক্ষেত্রে বাহ্যিকতার থেকেও যে বিষয় প্রধান তা হল নাম সংকীর্তন সহকারে ধূপসেবা আরতি করা। এটি আসলে সহজ পুজো এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হবার উপায় বলা চলে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে তৃতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে যে "উৎকৃষ্ট ধূপ অর্পণ করিলে যাবতীয় কামনা সুপ্রসিদ্ধ হয়; তুরুষ্কধূপ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-ফল প্রাপ্ত হইতে পারে; কৃত্রিক উত্তম ধূপ প্রদান করিলে সকল প্রকার

কামনা সফল হয়; উহা গন্ধবিশিষ্ট করিয়া প্রদান করিলে গোমেধযজ্ঞের ফল হয়, বসন্ত ঋতুতে গুগগুল অর্পণ করলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ-ফল হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে চন্দনসার দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষা ঋতুতে তুরষ্কধূপ অর্পণ করিলে উত্তমত্ব সিদ্ধি হয় এবং শরৎ ঋতুতে কর্পূর অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে মৃগনাভি অর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় এবং শীতকালে অগুরুসার প্রদান করিলে সর্বযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে"। বৈষ্ণব স্মার্ত গ্রন্থ হরিভক্তিবিলাস অনুসারে নিত্য ধূপ করলে ধূপকর্তার ভক্তি ধূপশিখার পবিত্র ধোঁয়ার মতোই ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে।

"ধূপলেখা যথৈবোর্দ্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধগতো নিত্যং ধূপদানাদ্ভবেন্নরঃ।।"

উপরোক্ত বিষয় থেকে এটি বুঝতে হয়তো আর কোনো সমস্যা থাকছে না বৈষ্ণব পুজোতে বৈষ্ণবাগ্নিকে হোমাগ্নি ও ধূপাগ্নির ক্ষেত্রে একই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মনে হয় বৈষ্ণব ভাবনায় পুজোকে সহজ ও সরল করে সকলের বোধগম্য করতেই এই বিধান। আসলে ধূপ এবং হোম থেকে যে পবিত্র ধোঁয়া উৎপন্ন হয়ে থাকে তা একইরকম ভাবে এক নৈসর্গিক অনুভূতি করায় তাই এই হোম-যজ্ঞ-ধূপকে এক সূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তবে ধূপ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধও রয়েছে, যেমন মৃগমদ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীজ কোনো বস্তুই ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ প্রাণীজ বস্তু কখনোই সেই সুগন্ধি দিতে পারে না যা উদ্ভিজ ভেষজ বস্তু দিয়ে থাকে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে মাধবকে কখনোই যক্ষধূপ অর্থাৎ শাল নির্যাস রূপ ধূপ প্রদান করা সঠিক নয়। তবে যক্ষধূপ বলতে দেবদারু গাছের কালো গোঁদকেও বোঝানো হয় উত্তর ভারতে। ধুনো দেওয়ার ক্ষেত্রে নারায়ণের পুজোতে কোনো নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ আছে বলে জানা নেই কারণ নারায়ণের সঙ্গে দেবী লক্ষ্মীও পূজিত হয়ে থাকেন এবং গুগগুল ও ধুনো সহকারেই তাঁদের যুগল আরাধনা করা হয়ে থাকে। অনেক পণ্ডিতের মতে পুরাণ ও নানা গ্রন্থে পরবর্তীতে বেশ কিছু সংযোজন করা হয়েছে বৈষ্ণব ও শাক্ত পুজোকে আলাদা ভাবে দেখানোর জন্য তাই এগুলি একমাত্র নিষেধ বলা যাবে না। তবে শাল নির্যাস ধূপের মধ্যে হলুদ ধুনো এবং কালো ধুনো দুই প্রকার হয়ে থাকে। কেবলমাত্র কালো ধুনোকে মন্দধূপ বলা হয়েছে। পীত ও কালো দুই ধুনোর মিশ্রণকে যক্ষধূপ বলা হয় যা বিষ্ণুপুজোর অযোগ্য ধূপ।

লক্ষ্মীজনার্দনের পুজোতে ধূপ ব্যবহার বিষয়ে এক অবাঙালি রামায়েত বৈষ্ণবের কথা এখানে না বললে বৈষ্ণব ধূপসেবার ভাবনাটাই যেন অনেকটা না বলা থেকে যায়। সেই বৈষ্ণব বাবাজির কথায় 'ঈশ্বর কে আমরা কী দিতে পারি নিজের প্রাণবায়ু ছাড়া, আর এই প্রাণবায়ু নিবেদনের বাহ্যিক রূপ হল এই ধূপ নিবেদন। নিজের

অন্তরের নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস যখন বাহ্যিক ধূপের পবিত্র ধোঁয়ার সঙ্গে একাকার হয়ে প্রভুর চরণে নিবেদিত হয় তখন সব রামময় হয়ে ওঠে। জানকী-রঘুনাথ ছাড়া তখন আর কিছুই থাকে না মনে প্রাণে। আসলে ধূপের ধোঁয়া হল সম্পূর্ণ নিবেদন তাকে আর ভোগ-চরণামৃতের মতো পুনরায় পাওয়া যায় না তাই এই ধূপাগ্নি কেবলই বৈরাগ্যের আর ধূপের সুগন্ধি অনুরাগের। এই ভাবনাই হল আসল ভালোবাসার ভাবনা। এখানে কোনো মন্ত্র নেই কঠিন ক্রিয়া নেই আছে কেবল আরাধ্যের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর ভালোবাসা। এই প্রেম নিবেদন কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আসলে প্রকৃত ভক্তের কাছে প্রভুর প্রীতি আর তাঁর প্রেম অনুভব হল সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি। ধূপের এই সহজ পদ্ধতি তাতে সহায়তা করে। ভক্তের কাছে বেদ-পুরাণের জ্ঞান বা অনেক শাস্ত্র-শাস্ত্রাচার কোনো কিছুই কিছু নয়, সে শুধু তাঁর আরাধ্যকে অনুভূতির মাধ্যমে খোঁজে। যদি ভেষজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলি তাহলে ভেষজ ধূপের ধোঁয়া মনকে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে একাগ্রতা দেয়। তাই ধূপ আরাধনার মাধ্যমে বা ধূপ আরতি (ধূপ-দীপে আরতি) নিজের অন্তরমনকে বিষ্ণু পাদপদ্মে সম্পূর্ণ নিবেদন করে একাগ্র হতে সহায়তা করে থাকে।

মাতৃ আরাধনার মধ্যে যেমন রয়েছে বৈদিক আচার নিয়ম আবার রয়েছে তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি ও নানা লৌকিক রীতিনীতিও, অর্থাৎ বৈদিক ও তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রাচার এবং লৌকিক আচার নিয়েই মাতৃ আরাধনা। অনেকেরই মনে হতে পারে লৌকিক নিয়মকে কী শিষ্টাচার বলা যায়। এ বিষয়ে একটা কথা এখানে বলি তা হল মৌখিক লৌকিক নিয়মগুলিই কিন্তু পরবর্তীতে স্মৃতিশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কারণ বেদ মুখে মুখে শ্রুতি থেকেই কিন্তু শাস্ত্র হিসাবে তার সংরক্ষণ আবার লৌকিক ও তন্ত্রের আচারের অনেক গুলিই এখনো মুখেই রয়ে গিয়েছে কিন্তু সেগুলি যে শাস্ত্রাচার নয় এটা বলা হয়তো পুরোপুরি সঠিক নয়। রামায়ণে আমরা এমন অনেক নিয়ম আচারের বিষয়ে দেখি যা তথাকথিত বৈদিক আচার নয় কিন্তু সেগুলো শাস্ত্রাচার নয় এটা বলা যাবে না। দেবী পুজোর ক্ষেত্রেও বর্তমানে ধূপ নিবেদন, ধুনো পোড়ানো, ধূপ আরতি বা ধুনুচি আরতি যতটা বিশেষ ততটাই বৈদিক মতে হোম করাও আবার সন্ধিক্ষণে ধূপপুজো করে দেবীর প্রীতি কামনাও পুজোর অঙ্গ। আসলে দেবীপুজোর ক্ষেত্রে বৈদিক, তন্ত্র ও লোকাচার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। তন্ত্রের আচারের সাধারণ প্রকাশ যেমন লৌকিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বেশি প্রকাশিত আবার তন্ত্রোক্ত দশোপচার বা ষোড়শোপচার পূজা বিধিতে দেখা যাবে প্রতিটি উপচার কোনো না কোনো যজ্ঞফল প্রদানকারী রূপে বর্ণিত। দেবীপুজোর বেদজ্ঞান ও তন্ত্র ক্রিয়ার একাকার ভাবনা আমাদের অতি পরিচিত শ্রীশ্রীচণ্ডী বা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত হয়েছে সর্বজনবিদিত হিসাবে। মহিষাসুরকে বধ করবার পর দেবতারা দেবীকে

যে উপচারে পুজো করেছিলেন তা একপ্রকার গন্ধ ধূপ নিবেদনের আরাধনাই। হিন্দিতে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটিকে দেবীর অনুলেপন ও অনুবাসনের দ্বারা পুজো বলা হয়েছে। অর্থাৎ গন্ধ চন্দন লেপন ও পুষ্পমাল্য দ্বারা অনুলেপন করে ধূপিত করে অনুবাসন। শ্রীশ্রী চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকটি হল—

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।।
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ।।
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈঃ সুধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্।

দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী মতে মহাকবি বিদ্যাপতি বলেছেন, "সর্ব্বেষামেবা ধূপানাং দুর্গায়া গুগগুলুঃ প্রিয়ঃ" অর্থাৎ সমস্ত ধূপের মধ্যে দেবী দুর্গার গুগগুল সবচেয়ে অধিক প্রিয়, বিশেষ করে তা যদি ঘৃত মিশ্রিত হয়ে থাকে তবে তা আরো সঠিক হয় দেবীকে ধূপ প্রদানের ক্ষেত্রে। বিল্বপত্র ধূপ আর বিল্বফল ধূপও দেবীর প্রীতি বর্ধন করে। ঘৃতযুক্ত গুগগুলের সঙ্গে ঘৃতাক্ত বিল্বফল দিয়ে ধূপ করাকে যজ্ঞধূপ বলা হয় যার মাধ্যমে দেবী আরাধনায় বাজপেয় যজ্ঞ ফল লাভ হয়, "মহিষাখ্যং ঘৃতাক্তন্ত দত্বা বিল্বমথাপিবা। বাজপেয় ফলং প্রাপ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে"। অগরু ধূপকেও যজ্ঞধূপ বলা হয়েছে—"অগুরুং ধূপমাবেদ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ"। যজ্ঞধূপ দিয়ে দেবীর ধূপ আরাত্রিক করা যেতে পারে। আবার ধূপ সামগ্রী দ্বারা দেবীর হোম ক্রিয়াও করা যেতে পারে। দুর্গাপুজোকে অনেক জায়গায় স্থানীয় কথ্য ভাষায় বলা হয়েছে 'ধুনো উৎসব'। তবে দুর্গাপুজো যেহেতু কেবল মাত্র শাক্ত মতে নয় বৈষ্ণব মতেও হয়ে থাকে তাই মাকে বৈষ্ণবী রূপে বৈষ্ণব পুজোয় ব্যবহৃত ধূপ দিয়েও ধূপায়িত করা যায়। অনেক বাড়িতে সন্ধিক্ষণের পুজোতে দীপমালার ব্যবহার হয় না বৈষ্ণব মতে দীপমালার বদলে দেওয়া হয় জোড়া ধুনুচি ধূপ ধূম। এই বিষয়টি আসলে লৌকিক বিশ্বাস থেকেই অনেকটা এসেছে যার কারণ হল বলি না দিলে সেখানে দীপমালা প্রজ্জ্বলনের কোনো প্রয়োজন হয় না। আলোর অভাবে বলিতে বাধা পড়তে পারে তাই দীপমালার ব্যবহার। বৈষ্ণব মতে দেবী আরাধনায় তাই জোড়া যজ্ঞধূপ নিবেদন করা হয় কুলাচার মেনে।

দেবীপুজোতে ধূপকে আসলে সাধনার অঙ্গ হিসাবে দেখা হয় অর্থাৎ ধূপ যেমন পুড়ে তার গন্ধ বিলায় ঠিক তেমনি নিজের অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, ক্রোধ সব এই ধূপ অগ্নিতে আহুতি দিলে তবেই মন মায়ের ব্রহ্মপদ লাভ করে। উত্তর ভারতের নবরাত্রি উৎসবের ক্ষেত্রে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না কারণ সেখানে দেবীর পুজো নয় দিন ধরে সেবা পুজোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। সঙ্গে বাড়ির গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী সংক্ষিপ্ত হোম বা ধূপহোম করে দেবীর পুজো করেন। নবরাত্রি বিষয়ে যতটুকু আমি

নিজে দেখেছি তা হল মায়ের দীপ জ্বালিয়ে, ধুনি জ্বালিয়ে ও সংক্ষিপ্ত হোম করে প্রতিদিনের পুজো।

শাক্ত পূজারিদের কথায় দেবীকে ধূপ নিবেদন করতে হলে সেটি পূর্ণ ভাবে করতে হবে মন্ত্র এবং ক্রিয়া দুয়ের মাধ্যমেই। দেবীপুরাণে বলা হয়েছে গন্ধহীন ক্রিয়াতে মন্দভাগ্য হয় (গন্ধ হীনেত্বভাগ্যতাং) ও ধূপহীন কোনো ক্রিয়া করলে তা উদ্বেগ যুক্ত হয় (ধূপহীনে তথোদ্বেগং)। ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে প্রথমে দেবীর বাম দিকে ধূপ রেখে তাতে কোশাকুশির ত্রিপত্র দ্বারা জল প্রোক্ষণ করে বলতে হয় 'এতস্যৈ বং ধূপায় নমঃ'। এবার সচন্দন পুষ্প নিয়ে বলতে হবে 'এতে গন্ধপুষ্পে ধূপায় নমঃ'। এবার অধিপতি বিষ্ণুকে ধূপ সমর্পণ করে বলতে হবে 'এতে গন্ধপুষ্পে এতধিপতয়ে ওঁ দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ'। এরপর দেবীর উদ্দেশে সমর্পণ করে বলতে হবে 'এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং দুর্গা দেব্যৈ নমঃ'। এবার ধূপ মাকে এমন ভাবে দেখাতে হবে যেন মা সেই ধূপের সুগন্ধ গ্রহণ করছেন আর সাথে বলতে হবে "ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্য সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম। ওঁ কর্মজ্ঞানময়ো যদিন্দ্রিয়গণঃ ক্ষিপ্তো বিরাগানলে। দেব্যাঃ মাতুর্দশাঙ্গদাহসুরভীর্ধূপঃ সদা বল্লভঃ।"। এই ভাবে ধূপ প্রদান করে ঘণ্টা বাদন সহ সংক্ষিপ্ত আরতি করে বলতে হবে "এষ ধূপঃ ভগবতী জগদম্বে দুর্গা দেব্যৈই নিবেদয়ামি।"। ধূপ দান প্রক্রিয়ার শেষে সেটি আবার দেবীর বাম পাশেই স্থাপন করতে হবে। ধূপ প্রদানের ক্ষেত্রে ধূপপাত্রও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্দিষ্ট ধূপ আধারে অর্থাৎ ধূপদানে রেখেই ধূপ নিবেদন করতে হবে। দেবী দুর্গাকে তৈজস দানের ক্ষেত্রে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে বলা হয়েছে স্বর্ণা তৈজস, রৌপ্য তৈজস, পিতল তৈজস বা মৃৎ তৈজস দান করা সবচেয়ে উত্তম। দুর্গাপুজো যেহেতু আগে রাজাদের পুজো ছিল তাই স্বর্ণা তৈজস, রৌপ্য তৈজস দেওয়া হত। গৃহস্থের পুজোর ক্ষেত্রে পিতল তৈজস সবচেয়ে উত্তম। তাই পিতল ধুনুচিতে ধূপ করা সবচেয়ে ভালো, তবে সামর্থ না থাকলে মাটির ধূপপাত্রে ধূপ দেওয়া যেতেই পারে। এখানে একটি কথা বলে রাখি যদিও এটি লোকবিশ্বাস থেকেই এসেছে তবুও অনেক শাক্ত পণ্ডিতের কথায় গৃহস্থের দেবী পুজোতে ঘট বাদে অন্য সব কিছু পিতলের হওয়াই সঠিক। মাটির ঘট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পুজোর ক্ষেত্রে কিন্তু মাটির পাত্রে ধূপদান গৃহস্থ পুজোতে না করাই শ্রেয়। আসলে শ্মশানে বা তামসিক ভাবে দেবী পুজোর ক্ষেত্রে ধাতব তৈজস ব্যবহার হয় না। হয়তো গৃহীর পুজোকে আলাদা করতে বা দৃষ্টিনন্দন করতেই পিতল তৈজস ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। যদিও আগেই বলেছি এটি লৌকিক বিশ্বাস। পিতলের ধুনুচি পাত্রে ধূপ আরতি করার ক্ষেত্রে দেবীকে দশাঙ্গধূপ নিবেদন করে বলতে হবে "দশাঙ্গগুগগুলং ধূপং

চন্দনাগরুসংযুক্তম্। সমর্পিতং ময়া ভক্ত্যা মহাদেবী প্রতিগৃহ্যতাম।" এষ আরাত্রিক ধূপঃ ভগবতী দুর্গা দৈব্যৈ নিবেদয়ামি।

দেবী যেমন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা তিনি আবার অভয়া রূপে অন্নপূর্ণাও। তাই দুর্গাপুজোয় অনেক পরিবারেই অভয়ারূপে দেবীর আবাহন করা হয়ে থাকে। অন্নপূর্ণা পুজো কিন্তু সেই অর্থে বাংলার নিজস্ব পুজো। বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী শহর ছাড়া এই পুজো সেই ভাবে কিন্তু প্রচলিত দেখা যায় না। যদিও দক্ষিণ ভারতে এই পুজোর চলন রয়েছে, সেখানে দেবী অন্নপূর্ণা পূজিত হন মহেশ্বর ছাড়াই। কিন্তু শিব শক্তির এই যৌথ পুজো শুধু বাংলা এবং বারাণসীতেই সাড়ম্বরে পালিত হয়। মা অন্নপূর্ণাকে হয়তো অন্নদাত্রী হিসাবেই দেখতে আমরা অভ্যস্থ কিন্তু মা অন্নপূর্ণা বাস্তবে হলেন জ্ঞান বৈরাগ্যদাত্রী। মা অন্নপূর্ণার প্রণাম মন্ত্রে তাই দেবীর কাছে চাওয়া হয়েছে জ্ঞান ও বৈরাগ্য (জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধার্থ্যং ভিক্ষাং দেহি অন্নপূর্ণে নমোহস্তুতে)। ধূপ হল সেই বৈরাগ্য স্বরূপ আর প্রদীপ হল জ্ঞানের প্রতীক। দেবীর শ্রী চরণে বৈরাগ্য ভিক্ষা চেয়ে ধূপ নিবেদন করা হয়ে থাকে আর ধূপ নিবেদনের মন্ত্রে বলা হয় "ওঁ হ্রীং ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা।" "ওঁ বনস্পতি রসো দিব্য গন্ধাঢ্য সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম।।" "এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে নিবেদয়ামি।।" এই ধূপ নিয়ে দেবীর সামনে দশবার আবর্তন করতে হয় আরতির মতো। অন্নপূর্ণা পুজো নিয়ে ও তার উপচার আচার নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক দ্বিমত রয়েছে তবে মা অন্নপূর্ণার ধাম কাশীতে গিয়ে এটুকু অনুভব করা যায় যে মা সেখানে যতটা সাকার রূপে বিরাজমান ততটাই নিরাকার রূপে বিরাজমান। কাশির ধূলিকণা সব কিছুই যেন দেবী অন্নপূর্ণার দান কারণ কাশী আগে ছিল মহাশ্মশান যা মা অন্নপূর্ণার আগমনে আনন্দ কানন হয়েছে। মা অন্নপূর্ণা হলেন বৈরাগ্যের ও জ্ঞানের দ্বার, যোগরাজ মহাদেবের কাছে পৌঁছাতে হলে মা অন্নপূর্ণার মাধ্যমেই পৌঁছাতে হবে। মায়ের কাছে প্রতীকী ভাবে ধূপ নিবেদন হল নিজের সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে সেই বৈরাগ্যকে আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত করা, যার মধ্যে শিবরূপ জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করা যায়। প্রকৃত শাক্ত সাধকদের কাছে তাই ধূপ নিবেদন হল প্রত্যক্ষ নিবেদন কারণ মা তা সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন আর ধূপের পবিত্র ধোঁয়া সব মলিনতা দূর করে পবিত্র করে তোলে মনকে শরীরকে যা ঈশ্বরের পাদপদ্মে একাগ্র করে আধ্যাত্মিক উচ্চতায় পৌঁছতে সহায়তা করে।

এখানে বৈষ্ণব ধূপ ও দুর্গা ধূপ আলোচনার সঙ্গে অন্নপূর্ণা পুজোর বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হল তাঁর কারণ অন্নপূর্ণা পুজো এক অর্থে যেমন লৌকিক কথা নির্ভর পুজো আবার এক অর্থে তান্ত্রিক পুজো। তান্ত্রিক পুজো বলতে আমরা কেবল কোনো বিশেষ সিদ্ধি লাভের জন্য করা পুজোকেই বুঝে থাকি কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই

আসলে বৈরাগ্যের পুজো যার সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ আমার কাছে অন্নপূর্ণা পুজো মনে হয়েছে। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে বৈরাগ্যরূপ ধূপ যে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে তাই হল পরম সিদ্ধি। দেখতে গেলে বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো, শাক্ত দুর্গা পুজো এবং অন্নপূর্ণা পুজো এই পুজোগুলির মধ্যে গৃহস্থ ভাবনা অনেক বেশি জড়িয়ে রয়েছে যা একদিকে যেমন লৌকিক পাঁচালি ও নানা কথার মধ্যে দিয়ে সজীব রয়েছে তেমনি নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন আরাধনা পদ্ধতির মাধ্যমেও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

শৈব আরাধনা যতটা আদি ততটাই অনাড়ম্বর এক আরাধনা। দেবাদিদেব মহাদেব পুজোর উপচার তো অনেক দূরের অনেক জায়গায় নেহাৎ গাছের ছায়াতেই ভক্তের সরল আরাধনা গ্রহণ করেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে তন্ত্রের বক্তা মহেশ্বর আর তন্ত্রের শ্রোতা মহেশ্বরী আরাধনা ক্রিয়াদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমাদের দান করলেও নিজেরা উমামহেশ্বর বা হরপার্বতী রূপে পুজো গ্রহণ করেন নেহাৎই লৌকিক ভাবে। বাংলা তথা কাশীর এমন অনেক শিবমন্দির রয়েছে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট পূজারি পুজো করেন না বরং স্থানীয় যে কেউ সেই মন্দিরে ধূপ-দীপ দিয়ে নিজের উপচারে সেবা পুজো করেন। মহাকালের নগরী উজ্জয়িনীতে ভস্ম আরতি, ধূপ আরতি এই সব কোথায় যেন মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের সবকিছুই অনিত্য তা একদিন ধূম্র হয়ে বিলীন হয়ে যাবে আর থেকে যাবে কেবল ভস্ম। এই ভস্মকেই তাই মহাদেব তাঁর পুজোর সবচেয়ে পছন্দের উপচার হিসাবে গ্রহণ করেন। নিজের মনে অহং থাকলে তা নিয়ে কখনও শিবত্বকে প্রাপ্ত করা যায় না। আগে নিজের সবকিছু প্রতীকী ধূপের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সমর্পণ করতে হয় তারপর তা থেকে কামনাহীন যে ধূম্র উৎপন্ন হয় তাই আমাদের অন্তর আত্মাকে শিবরূপ করে তোলে। শৈব ধূপ আরাধনার এই হল মূল তত্ত্ব।

ধুনুচি ধূপ হল মনরূপ তেজ ও প্রাণবায়ুর মাধ্যমে মনসংযম করার বাহ্যিক প্রতীক। নিজের আমিকে পুড়িয়ে তবেই তা শুদ্ধ পবিত্র হয় আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে। তাই বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এখানে কোনো বিষয় নয় কারণ পুজো পদ্ধতি আলাদা হলেও মূল ভাবনা এক্ষেত্রে একই থাকে সকল আরাধনাতেই। অহংকারকে ত্যাগ দিয়ে ঈশ্বরের তা সে দেব হোক বা দেবীর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করাই ধূপ নিবেদন উপচার আমাদের শিক্ষা দেয়।

ধূপপাত্র ধুনুচি ও বাণিজ্যে ধূপধুনো

আসলে ধূপ জ্বালাতে হলে যেমন ধূপধুনোর প্রয়োজন হবেই তেমন ধুনুচি অর্থাৎ ধূপপাত্র ছাড়া ধূপ জ্বালানো সম্ভব নয়। যদি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁজের কথা বলি তাহলে দেখা যাবে যে ভারতে অনেক প্রাচীন সময় থেকেই এই ধূপপাত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা তামিলেও এই ধূপপাত্রের বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় সাথে ভারতের নানা প্রদেশের নানা ভাষাতেও এই ধুনুচি ব্যবহারের কথা আছে। বাংলা বাদে বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিল ও কোঙ্কণ প্রদেশের বহু লোক পরম্পরাতে এখনও ধুনুচি ধূপের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায়। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে রামায়ণ এবং মহাভারতের সময়কাল থেকেই এই ধূপপাত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে। ভারতে ধাতুর আধিক্য অনেক বেশি থাকাতে তামা এবং পিতলের ধূপপাত্র অনেক আগে থেকেই ব্যবহার হত বলেই তাঁদের মত। আসলে ধুনুচির আকার প্রকৃতি প্রদেশ বিশেষে যেমন বদলে যায় আবার অনেক সময় জেলা বিশেষেও বদলে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ব্যবহার্য হিসাবেও বদলে যায়। আসলে আমাদের এক এক প্রদেশে যেমন শিল্পকলা আলাদা ধরনের হয়ে থাকে সেই রকম আলাদা আলাদা জেলাতেও অনেকটা না হলেও কিছুটা আলাদা হয়ে থাকে। যেমন বাংলার কলকাতার ধুনুচির শিল্পকলা যে প্রকৃতির তার সঙ্গে কিন্তু নদিয়ার নবদ্বীপের ধুনুচির কিছুটা গঠনশৈলীতে পার্থক্য আছে। আবার বাংলার এবং বেনারসের আরতির জন্য ব্যবহৃত ধুনুচি দেখতে অনেকটা এক মনে হলেও হাতলের কারিগরির দিক থেকে অনেকটা আলাদা। বাংলার ধুনুচির হাতলখানি অর্ধ গোলাকার হয়ে থাকে কিন্তু বেনারসের দিকের এই হাতলটি লম্বা ধরনের হয়ে থাকে। আবার মহারাষ্ট্রের দিকে ধুনুচিগুলির হাতল বেশিরভাগই কাঠের তৈরি। বৃন্দাবন বা রাজস্থানের দিকে ধুনুচির যে ব্যবহার হয় তা পদ্মধুনুচি। পদ্মের পাঁপড়ির মতো নকশাতে ধুনুচিগুলি তৈরি তবে মহারাষ্ট্রের মতো কাঠের হাতল নয় সেক্ষেত্রে পিতলের হাতলই থাকে। ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে আবার ধুনুচির উপরের বাটির আকারটি বেশ বড়ো থাকে আর হাতলটি থাকে অনেকটাই নাগের আকৃতির।

আসলে প্রাচীন সময়ে দেবতাকে যখন আলাদা করে ভোগ নৈবেদ্য নিবেদন করার বদলে এই ঔষধি গাছের গন্ধ নৈবেদ্য দেওয়া হত তখন থেকেই ধূপারতি এবং ধুনুচির ব্যবহার। যেহেতু এই পাত্রের ব্যবহার প্রাচীন তাই বর্তমানেও ধূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পাত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত গ্রন্থে ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ধূপ কখনোই ঘটে বা থালায় রেখে ভগবানকে দেওয়া উচিত নয় নির্দিষ্ট ধূপাধারে রেখেই ধূপ নিবেদন করা উচিত সবসময়।

"ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা।
যথা তথাধারগতং কৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ।।"

ধুনুচি যে পুজোর জন্য ব্যবহার করা হয় এটি যেমন সত্যি তেমনই বহু সময় ধরেই এটি ভারতের বাণিজ্যের একটি বিশেষ অর্থকরী দিকও বটে। ভারতের প্রাচীন ব্যবসাগুলির মধ্যে তামা ও পিতলের ব্যবসা সবচেয়ে বেশি অর্থকরী ছিল। বাংলা, বারাণসী এবং বিহার ছিল পূর্বভারতের পিতল ব্যবসার গড়। আসলে পূর্বভারতে ছিল তামার খনি তাই নানা ধাতুর তৈজসের ব্যবহার এবং এই ধরনের ব্যবসার এখনও অনেকটাই এই অংশে দেখা যায়। কলকাতা, হাওড়া, নবদ্বীপ, পাটনা, ভাগলপুর, বেনারস, মির্জাপুর এবং জৌনপুর ছিল এই বাসন তৈরির জন্য বিখ্যাত। ভারতের নানা প্রদেশেই পিতলের বাসন তৈরি হয়ে থাকে কিন্তু এই জায়গাগুলো ধূপপাত্র এবং আরতির ঝাড়প্রদীপ বানানোর জন্য গোটা দেশের মধ্যে বিখ্যাত। বারাণসীর গঙ্গা আরতি যেমন ভারতের আচার-পরম্পরার ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়ে থাকে তেমনি ভারতের সমৃদ্ধ হস্ত শিল্পকলার পরিচয় দিয়ে থাকে আরতিতে ব্যবহৃত ধুনুচি, প্রদীপ এবং অন্য জিনিসের ব্যবহারের মাধ্যমে। বারাণসীর অনেকের কথায় বিদেশি বিদেশিনীরা যেমন এখানকার গঙ্গা ঘাট এবং আরতি ক্যামেরা বন্দি করে থাকেন ঠিক তেমন এই আরতিতে ব্যবহৃত পাত্রগুলিও কিনে নিয়ে যান তাঁদের বারাণসী ভ্রমণের সাক্ষী হিসাবে। তবে কেবল শোনা কথা নয় আমি নিজেও বেনারস গিয়ে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি। আসলে বারাণসীকে শাড়ির জন্য যতটা প্রমোট করা হয়ে থাকে এই পিতলের বাসনের জন্য ততো নয়, বেনারসের বানিয়াদের (বণিক জাতির) আদি ব্যবসা কিন্তু এটাই, যার প্রমাণ এখনো বিশ্বনাথগলি এবং ঠাঠেরি বাজারে পাওয়া যায়। বাংলা ধাঁচের পিতল ধুনুচি বাংলার নবদ্বীপে এখনও ব্যবহার হয়ে থাকে এবং সেখানকার পিতল বাজারেও পাওয়া যায় কিন্তু চাহিদা কমের জন্য ধীরে ধীরে এইগুলি তৈরিও কম হচ্ছে তবে এখনও অর্ডার দিয়ে বানানো যায় এই সব ধুনুচি এবং পঞ্চপ্রদীপ। আসলে ধীরে ধীরে মেশিনে তৈরি ধূপপাত্রের দীপপাত্রের চাহিদা বাড়ছে কারণ হাতে তৈরি এইসব জিনিসগুলির থেকে তা অনেকটাই সস্তা এবং ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও অনেকটাই হালকা। তবে যে সৌন্দর্য্য হাতে তৈরি এই

জাতীয় পিতল পাত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা মেশিনে তৈরি পাত্রগুলির ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। সরকারের উচিত এইসব হস্তশিল্প যাতে হারিয়ে না যায় তা নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া। এগুলি ব্যবহারের জন্য সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে কারণ এগুলোই আমাদের দেশের নিজস্ব ব্যবসা। বেশ কিছু হস্তশিল্প মেলার আয়োজন হলেও বর্তমানে সেখানে এই পুজোবাসনগুলির প্রাধান্য অনেকটাই কম বা নেই বললেই চলে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ধুনুচিও কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতির একটা আইকন এবং বাঙালিয়ানার বনেদি পরিচিতি তাই এটি যাতে হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে আমাদেরকেই সজাগ হতে হবে। বেনারসে আরতির মাধ্যমে যেমন এই পাত্রগুলির সংরক্ষণ হচ্ছে বাংলাকেও তাঁদের উৎসবকে সামনে রেখে এই ধুনুচি পঞ্চপ্রদীপ পাত্রগুলি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

ধুনুচির পরে এবার আসা যাক ধূপ-ধুনোর ব্যবসার বিষয়ে। আসলে ভারতের পূর্বপ্রান্তে এখনও যদি পুরোনো ব্যবসার মধ্যে দেখি তাহলে এই কাঁসা-পিতলের ব্যবসা আর ধূপ-ধুনোর ব্যবসা অর্থাৎ যার আধুনিক নাম দশকর্মার ব্যবসা, এখনও স্ব-মহিমায় টিকে রয়েছে। এই ধূপ-ধুনোর ব্যবসা মূলত করতেন বা এখনও তার অনেকটাই করেন গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা যাঁদের আরাধ্য দেবী হলেন মা গন্ধেশ্বরী। পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে উত্তর ও পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ছিল এই ব্যবসার ব্যাপ্তি। তবে ধূপের ব্যবসার প্রাচীন ইতিহাস যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে তা প্রয়াগ ও বারাণসী থেকে শুরু করে বাংলা ও ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে এই ব্যবসার সবচেয়ে ভালো জায়গা ছিল রাজস্থান। মাড়োয়ারি আগরওয়ালরা কিন্তু এই ধূপ-গুগ্গুলের ব্যবসা করতেই গঙ্গার তীরবর্তী পূর্বাঞ্চল (পূর্ব উত্তর প্রদেশ) এবং পরে বাংলায় আসে। বাংলায় ব্যবসার ও বসতির পরিবেশ ভালো থাকায় ধীরে ধীরে অন্য ব্যবসায় মন দেয় তাঁরা। কলকাতার বড়বাজারে এখনও কিছু রাজস্থানের পুরানো ধূপ ব্যবসায়ীর দেখা মেলে। উনিশ শতকের বহু লেখাতে বলা হয়েছে বাঙালির ঘরে তিনটে জিনিস থাকবেই থাকবে তা হল হামানদিস্তা, কুলো আর পিতলের ধুনুচি। বেশ কিছু পুরানো হিন্দি সাহিত্যেও ধূপদান বা ধুপচির উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য এইসব হিন্দি সাহিত্য বা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে পাটনা, ভাগলপুর, দ্বারভাঙা, রাঁচি, বেনারস, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, কলকাতা থেকে। তাই ধুনুচির প্রচলন যখন পূর্ব ভারতে ছিল তাই ধূপ- ধুনোর ব্যবসাও যে এখানে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আগেকার সময় দুর্গাপুজোর সময় বাড়ি বাড়ি কাপড় বিক্রির মতোই পিতলের বাসন ও ধূপ-ধুনো বিক্রি করা হতো এমনকি ছোটো ছোটো অস্থায়ী দোকানও বসে যেত সেসময়।

বাংলায় এই ধূপ-ধুনোর ব্যবসায়ীরা মুনাফা অর্জন এতটাই করেছিল যে এই ধূপ ব্যবসায়ীরা সাড়ম্বরে তাঁদের গৃহে দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী অথবা গন্ধেশ্বরী পুজোর আয়োজন করতেন। গন্ধবণিক পরিবারগুলির সেই আগের অবস্থা আর এখন নেই কিন্তু অনেকের বাড়িতেই জোড়া ধুনুচি জ্বালিয়ে ঐতিহ্যের সেই পুজো হয়ে চলেছে। আসলে যেহেতু ধূপ-ধুনোর ব্যবসা থেকেই এই পরিবারগুলির উত্থান তাই এই ধূপের ব্যবহার পুজোতে মায়ের সামনে অধিক পরিমাণে করা হয় কোথাও নিয়ম হিসাবে আবার কোথাও বাণিজ্যে শ্রী বৃদ্ধির কামনা নিয়ে মায়ের সামনে এই জোড়া পিতলের ধুনুচিতে ধূপ নিবেদন করা হত মাকে, সঙ্গে মাঙ্গলিক ধুনো পোড়ানো অনুষ্ঠান। ধূপ-ধুনোর ব্যবসার সেই সুবর্ণ দিন এখন অস্ত গেলেও গন্ধেশ্বরী মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এখনও জোড়া ধুনুচি দিয়েই পুজো হয়ে থাকে। এই নিয়ম বেনারসের বেশ কিছু বাঙালি পরিবারের দুর্গাপুজোতেও দেখা যায়। আসলে বাঙালির হাওয়া পরিবর্তন থেকে তীর্থ এবং দ্বিতীয় বাসস্থান ছিল বেনারস। তাই বাংলা এবং হিন্দি সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে বেনারসে। সেই সময় বাণিজ্য এবং তীর্থে যাওয়ার সব থেকে উপযুক্ত মাধ্যম ছিল জলপথ আর কলকাতা থেকে গঙ্গা পথে সহজেই বারাণসীতে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার দর্শনের উদ্দেশে রওনা দেওয়া যেত তাই বাঙালির দ্বিতীয় বাসস্থান ছিল এই শহর, যার প্রমাণ এখনও বহন করে চলেছে অন্নপূর্ণার কাশীধাম। এখানকার বাঙালিটোলা, বিশ্বনাথগলি, ঠাঠেরি বাজারে তাই বেনারসের স্থানীয় বাঙালি ধূপ দশকর্ম ব্যবসায়ীর বা পিতলের বাসন ব্যবসায়ীর দেখা মেলে আজও। তবে আর কতদিন পূর্বভারতের এই প্রাচীন ধূপ ধুনুচির বাণিজ্য প্রদীপের শিখার মতো জ্বলতে থাকবে তা বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণাই জানেন।

পুজোপচারে ধূপ ও ধূপসেবা

পুজোর উপচারের মধ্যে ধূপ নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের যে যে উপচারে পুজো করা হয়ে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন পঞ্চোপচার, সপ্তোপচার, দশোপচার, দ্বাদশোপচার, ষোড়শোপচার। এছাড়াও আরো উপচার এমনকি সহস্র উপচারেও পুজো করা যায়, অর্থাৎ যার যেমন সামর্থ্য। তবে সাধারণ পুজোর ক্ষেত্রে পাঁচ, দশ এবং ষোলো উপচারেই পুজো করা হয়ে থাকে মূলত। দশ উপচারের মধ্যে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়; পঞ্চ উপচারের মধ্যে রয়েছে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (মত ভেদে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ)। যদি এই সব উপচারে পুজো করা সম্ভব নাও হয়ে থাকে বা সামর্থ্য নাও থেকে থাকে তবে কেবলমাত্র গন্ধ পুষ্পেই পুজো করা যেতে পারে। এই গন্ধ বলতে যেমন চন্দনকে বোঝানো হয়েছে আবার ধূপকেও বোঝানো হয়েছে। কারণ বনস্পতি ধূপের পবিত্র সুন্দর গন্ধ দেবতার সবচেয়ে প্রিয় মনে করা হয়। দেবতাকে এই সুন্দর গন্ধ এবং পুষ্প দিয়েই তাই সম্পূর্ণ পুজো করা যেতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ মতে নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে জল, ফুল এবং ধূপে পুজো করার কথা বলা হয়েছে আবার কালিকা পুরাণেও বলা হয়েছে কেবল পুষ্প, ধূপ-দীপে পুজো করলেই চার বর্গ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি সম্ভব।

গন্ধ ও পুষ্পের মধ্যে অনেকে বলেন চন্দন পুষ্পে আবার অনেকের মতেই চন্দন এবং ধূপ দুটিই গন্ধ দ্রব্য তাই দুটি দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ ত্রি-উপচার বলা যায় কারণ চন্দন, পুষ্প ও ধূপ সহযোগে পুজো। এই ভাবে পুজো করাকে সহজ পুজো বলা হয়ে থাকে। আসলে স্থান, কাল, প্রদেশ বিশেষে সবসময় সব সামগ্রী পাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এই বস্তুগুলি ভারতের এখনো পর্যন্ত যে যে প্রদেশে গিয়েছি তাতে দেখেছি খুব কষ্ট না করেই জোগাড় করে ওঠা যায়। যে-কোনো উপচারের মধ্যে তাই যদি একটু লক্ষ করে দেখি তাহলে বোঝা যাবে এই তিনটি উপাচারই হল প্রধান। দেবতাকে পা ধোয়ার জল দিয়ে তারপর আসন দিয়ে তারপর অর্ঘ্য তারপর পুষ্প, চন্দন দিয়ে পুজো করে ধূপ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আরতি করে দীপ দেখিয়ে আরতি

করে প্রণাম। আসলে এর মধ্যেই সহজ পুজোর ভাবটি লক্ষিত হয় যা পুষ্প-চন্দনে পুজো করে ধূপ-দীপ দিয়ে আরাত্রিক অর্চনা। আবার কেবল আরতি করলেও চন্দন পুষ্প অর্পণ করে ধূপ, দীপ, জলশঙ্খ, পুষ্প, চামর দিয়ে আরতি করে প্রণাম। আবার কেবল ধূপ, দীপ আরতি করেও পুজো করা হয়ে থাকে। এই ধূপারতি এবং আরতি বা পঞ্চ আরাত্রিককে তাই পুজোর অঙ্গ না বলে স্বতন্ত্র পুজো বলা হয়েছে।

বৈদিক নিয়ম পদ্ধতির অনেক আগে থেকেই এই নিয়মাচারগুলি পালিত হয়ে আসছে। আসলে আমরা সাধারণ যারা এতো শাস্ত্র বা পুঁথি সম্পর্কে জানি না তারা সহজ ভাবে লৌকিক পুজো আরাধনা করতেই বেশি অভ্যস্থ। দেখা যাবে এই ধরনের নিয়ম আচারই আমরা অনেক বেশি পালন করে থাকি তথাকথিত শাস্ত্রাচারের থেকে। আসলে এই উপচারের পুজোর ইতিহাস অনেক প্রাচীন, যার সূচনা দ্রাবিড়েরও আগে থাকা সভ্যতার প্রতীক মনে করা হয়। এই নিয়ম আচার কেবলমাত্র ক্রিয়ার মাধ্যমেই বেঁচে রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবার প্রদেশ বিশেষে বা অঞ্চল বিশেষে এগুলি বদলেও যায়। আমরা এই আচার পালন তথাকথিত শাস্ত্রাচারের থেকে বেশি করলেও এর অনেক বিভিন্নতা সম্পর্কেই জানি না কারণ তা আমরা চোখের সামনে সবসময় পালিত হতে দেখি না। আগম শাস্ত্রে ও স্মৃতি শাস্ত্রে এগুলোর অনেকগুলি সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক নিয়ম আচারই কেবল অভ্যাসের মধ্যে বেঁচে রয়েছে। ধূপ আরাধনা বা আরতির এই প্রথাটিও অনেকটাই তাই। এই পুজোর ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই। বলা হয় ঘটে ও পটে এই পুজো যে কেউ করতে পারেন এমনকি আনুষ্ঠানিক ভাবেও। এটি বৈধ সংক্ষিপ্ত পুজো। আবার অনেক সামগ্রীর অভাবেও পুজো করা যেতে পারে কেবলমাত্র জল দিয়ে। বাড়ির নিত্য পুজোর ক্ষেত্রেও এই গন্ধ-ধূপ-পুষ্পে পুজোকে উত্তম পুজো বলা হয়েছে। স্মার্ত অনেক পণ্ডিতদের মতে বাড়ির সিংহাসনে রাখা বিগ্রহেও এই পুজো করা যায় সহজেই কারণ সেখানে আলাদা করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিধি দেবালয় ও সংকল্পের পুজোর ক্ষেত্রে, গৃহদেবতাকে ধূপ-দীপ আরতি করতে করতেই নিত্য পুজোর মাধ্যমে তিনি প্রাণময় হয়ে ওঠেন।

দেবসেবা বলতে আমরা সাধারণত যা করে থাকি তা হল জল ফুল দেওয়া ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সংক্ষিপ্ত আরতি এবং সন্ধ্যায় আবার ধূপ-দীপ দেওয়া। কোথাও কোথাও আবার মধ্যাহ্ন ভোগ দেওয়ার চলন রয়েছে প্রধানত মন্দির বা যাঁদের বাড়িতেই বিগ্রহ রয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এটিকেই দেবসেবা ভেবে থাকলেও দেবসেবার কিন্তু অনেকগুলি অঙ্গ রয়েছে। সবার পক্ষে যেমন সব করা সম্ভব নয় তেমনি কোনো সেবা পদ্ধতিই একমাত্র বা আদর্শ বলা যাবে না কারণ সেবা মনের ভাবনা থেকে আসে নিজের আরাধ্যকে যে যেভাবে সেবা দিতে চায় তাঁরা সেভাবেই করতে পারেন।

ধূপসেবা অনেকটা সেই ভাবনা থেকেই এসেছে। ধূপসেবা নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ধূপের মাধ্যমে দেবতার সেবা। যদিও এই নিয়ম আমাদের কাছে খুব বিশেষ পরিচিত নয় তবে বারাণসী এবং প্রয়াগের বেশ কিছু গৃহস্থ বাড়ি সহ মঠ ও মন্দিরেও এই সেবার চলন রয়েছে। আসলে এক্ষেত্রে ধূপকেই নৈবেদ্য রূপে অর্পণ করা হয়ে থাকে। দেবতা গন্ধের মাধ্যমে ধূপ গ্রহণ করছেন এটি হল ধূপ সেবার মূল ভাবনা। ধূপ নিবেদন মন্ত্রে তাই বলা হচ্ছে "বনস্পতি রসো দিব্যঃ গন্ধর্বা সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম।" অর্থাৎ বনস্পতির রস সমৃদ্ধ গন্ধ যা দেবতাদের ভোজন সমান তাই আমি নিবেদন করছি। দক্ষিণ ভারতে এই ধূপ সেবা বা ধূপের মাধ্যমে নৈবেদ্য প্রদানকে বলা হয় 'ধূপ নৈবেদ্যম'।

ধূপসেবার এই পদ্ধতি আসলে প্রাকার্য আরাধনার একটি ধারা বলা চলে যা পরম্পরায় এবং অভ্যাসের মাধ্যমেই এখনো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ। অনেক স্মৃতি শাস্ত্রেই এগুলির কিছু কিছু উল্লেখ থাকলেও তাকে বৈদিক নিয়ম আচারের মতো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও বেদের অনেকাংশেই ধূপের বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়েছে। পুরাণের অনেকাংশেই এই গুলির বিধি উল্লেখ রয়েছে কিন্তু বিস্তৃত উল্লেখের অভাব রয়েছে। আমাদের অন্য স্মৃতি বা ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যেও অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা সেই অর্থে খোঁজ নিয়ে দেখি না। যার মধ্যে লোকাচার, কুলাচার, দেশাচার নিয়ে সহজ পুজো পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। রামায়ণ এবং মহাভারতে এই ধরনের অনেক নিয়ম আচারের কথা আছে যা হয়তো সেই অর্থে মৌখিক আচার নিয়ম হিসাবেই থেকে গিয়েছে একে অপরের কাছ থেকে শুনে বা জেনে তার পালন করে। অনেকে আবার মৌখিক লোকাচারকে তন্ত্রাচার নাম দিয়ে তন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যাও করেছেন। এগুলি বৈদিক না বলে যেমন অবহেলিত হয়েছে ঠিক আবার এগুলোর সংক্ষিপ্ত সংযোজন হোম অনুষ্ঠান বা পুজো আরাধনার ক্ষেত্রেও হয়েছে। আসলে বেদ তো কোনো কিছুকে বাদ দিতে বলেনি বরং সমস্ত ছোটো বড়ো পদ্ধতিকেই গ্রহণ করতে বলেছে। কারণ প্রত্যেক মানুষের জন্য একটিই পদ্ধতি হতে পারে না। এইখানেই আগম ও বেদের উদারতা। তাই সাধারণের অনেক নিয়ম আচারই বেদে স্থান পেয়েছে। আবার আরাধনার অনেকগুলি ধারাই ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে গিয়ে ঠেকেছে যেগুলো আজ হয়তো কেবলমাত্র টিকে রয়েছে কিছু মানুষের সযত্ন লালন পালনের ফলে। আসলে ধূপসেবা নিয়ে বলতে গেলে এই আলোচনার একটু প্রয়োজন ছিল নইলে হয়তো ধূপসেবা বিষয়টাই অস্পষ্ট থেকে যেত অনেকটা।

ধূপ সেবার মূল বিষয় হল দিনে চারবার দেবতাকে ধূপের মাধ্যমে সেবা বা আরাধনা করা। এর মধ্যে রয়েছে সকালের মঙ্গল ধূপ আরতি, পূর্বাহ্ন অর্থাৎ সকাল ৯.২৭ মিনিটের মধ্যে ধূপ নিবেদন এবং ধূপ-দীপ দিয়ে আরতি, মধ্যাহ্ন ধূপ ও

আরতি এবং সন্ধ্যা ধূপারতি। ধূপ সেবা করার সময় দেবতাকে প্রতিবারই দেওয়া হয় আচমনীয় জল। এই ধূপসেবা আবার ধূপবিলাস হিসাবেও করা হয় অনেক জায়গায় যদিও দুটির ভাবনা ও পদ্ধতি আলাদা। হাওড়ার এক গন্ধবণিক বাড়ির গৃহদেবী জগদ্ধাত্রীর সেবা করা হয় এই ধূপবিলাস করে। সকাল থেকে দুপুর বারোটা অবধি মায়ের সামনে জ্বালানো থাকে ধুনুচির ধূপ আবার বৈকালী দিয়ে সন্ধ্যা আরতি পর্যন্ত ধূপবিলাস করা হয়। জগদ্ধাত্রী পুজো, দুর্গা এবং বাসন্তী অষ্টমীতে সারাদিন দেবীর সামনে ধূপ জ্বালিয়ে ধূপবিলাস করা হয় এছাড়াও ধুনো পোড়ানোর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বেনারসে এই ধূপসেবা হল দেবতাকে নিজের করে পাওয়া অর্থাৎ অনেক কিছু আড়ম্বর না করেও যে এই সংক্ষিপ্ত আর সুন্দর পদ্ধতিতে দেবতাকে পাওয়া যেতে পারে তা বেনারসে কিছু দিন বসবাস করলেই বোঝা যায়। সকালের গঙ্গা আরতি থেকে শুরু করে ঘরের সরল আরতি বিধি তার মধ্যে এতটাই সরল ভাব যেন ভগবান আপনার একজন তাঁকে বিশেষ করে দেখবার কিছুই নেই। এই ধূপসেবা করবার ক্ষেত্রে তাই শুধু ধুনুচির ধূপ অর্থাৎ ধুনো আর গুগগুল হলেই চলে। এর সঙ্গেই ব্যবহার করা হয় গুড় ও ঘি। আমরা সাকারের উপাসনা করলেও এক অর্থে সেই সাকার মূর্তিকেই আমরা নিরাকার রূপে আমাদের চারপাশে অনুভব করতে চাই এই ধূপের ধোঁয়া সুগন্ধের মধ্য দিয়েই। আসলে যেমন অখণ্ড জ্যোতিকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি মনে করা হয়ে থাকে তেমনি ধূপের ধূপাগ্নির মধ্যেও এবং পবিত্র ধোঁয়ার সুগন্ধের মধ্যেও এই সাক্ষাৎ অনুভূতি সম্ভব। ধূপের ধোঁয়ার সাথে বায়ভূতে নিজের মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে একাকার করে ফেলা।

ধূপসেবার জন্য যে ধূপ ব্যবহার করা হবে তা কখনোই কিন্তু ধূপকাঠি হবে না কারণ এটি কৃত্রিম ধূপ। আসলে ষড়ঙ্গ অথবা অষ্টাঙ্গ ধূপ দিয়েই প্রধানত ধূপসেবা করা হয়ে থাকে কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে তা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ধূপ সেবার জন্য কর্পূর, ধুনা, গুগগুল, গুড় এবং ঘি একসাথে জ্বালালেও হবে। তবে এর সঙ্গে চন্দন বা অগুরু দেওয়া সম্ভব হলে খুবই ভালো হয়। যদি এই এতগুলির কিছুই দেওয়া সম্ভব না হয়ে থাকে তবে কেবল ধুনা-গুগগুল, ঘি-গুগগুল, কর্পূর-ধূনা, ঘি-ধুনা সহকারেও ধূপসেবার জন্য ধূপ জ্বালানো যেতে পারে। আসলে ধূপের দ্রব্য হল দেবতাদের হবি বা খাদ্য (নৈবেদ্য)। এই সুগন্ধের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভোজন করেন। বেদ, আগম এবং বহু স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে দেবতারা বায়ুভূতে সুগন্ধ দ্রব্যাদি গ্রহণ করে থাকেন। সাগ্নিক গৃহস্থ তন্ত্রও এটিকে নিত্য অগ্নি ক্রিয়া বলেছে। নিত্য ধূপ-ঘি সহ অগ্নিহোত্র করাও এই ভাবনার প্রতীক। ধূপ হল বায়ুর প্রতীক এবং এর মধ্যে অগ্নিও বিদ্যমান তাই ধূপ মাধ্যমে দেবতাদের ভোজন সম্পন্ন হয়ে থাকে। সাগ্নিক আরাধনার ভাবনায় বলা হয়েছে দেবতারা অগ্নির মাধ্যমে এবং বায়ুভূতেই নৈবেদ্য

গ্রহণ করেন। প্রাচীন বেদ এক্ষেত্রে যজ্ঞাগ্নির কথা যেমন বলেছে প্রাচীন তন্ত্র ধূপাগ্নির ধুনীর কথাও বলছে।

আজকাল আমাদের ব্যস্ত সময় তাই অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই ধূপসেবার নারকেল ছোবড়া বা এই সব কিছুর জোগান দেওয়া তো সহজ কথা নয়। গত দুই বছর ধরে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে গিয়ে যা দেখছি তা হল নারকেল নাড়ু তো অনেককাল আগেই প্যাকেট বন্দি হয়েছিল এবার নারকেলের ছোবড়া এবং ধূপ-ধুনো প্যাকেট বন্দি বিক্রি হচ্ছে। মানে ধূপ-ধুনো আগে ঠোঙায় দেওয়া হত এখনও অবশ্য গোটা ধুনো মানে ডেলা ধুনো যাকে বলে তা নিলে হয়তো ঠোঙার দেখা মিলবে কিন্তু এখন কে কষ্ট করে আর হামানদিস্তাতে ধুনো গুঁড়ো করবে তাই এই প্যাকেটের ব্যবস্থা। তাই বর্তমানে যদি খানিকটা অলসতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে এগুলোর ব্যবস্থা করা খুব কঠিন হবে না। যদি বাড়িতেও এই ধূপ-ধুনো গুগগুল বা নারকেল ছোবড়া কেটে ধূপের জোগাড় করতে চান তাহলে মাসে এক দুই দিনই যথেষ্ট। এগুলো ঠিক মতো গুছিয়ে রাখলে মাস খানেক চলেই যায় কারণ এগুলি নষ্ট হওয়ার কিছু বিষয় নেই তবে বর্ষাকালে কিছু কিছু সময় একটু সমস্যা হতে পারে। আসলে বাইরে থাকার সুবাদে দেখেছি প্রতিদিন পুজো করার ইচ্ছা থাকলেও ঠিক ভাবে করা সম্ভব হয় না কিন্তু এটি যেহেতু ধূপসেবা অর্থাৎ সেই অর্থে কোনো বিধিনিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই এটি দিনের দুটি সময় করা খুব কঠিন নয়। অনেক সময় কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরতে রাত্রির হলেও কিন্তু এটি করতে কোনো দ্বিধাবোধ হয়নি। কারণ এটি সেবা সেই অর্থে পুজো নয়। সেবা মনের আরাধনা পদ্ধতি বিধিনিয়মের অর্চনা নয়, সেই অর্থে সেবা হল সহজ পুজো।

ধূপসেবার ক্ষেত্রে কিন্তু কতগুলি বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে তা হল ধূপপাত্র মেজে ধুয়ে তবেই তা প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। ধূপ বলতে ধুনুচির ধূপ ব্যবহার করেই সেবা বা আরাধনা করতে হবে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নয়। এই ধূপসেবা কিন্তু কোনো বিশেষ পুজোর ক্ষেত্রেও করা যেতে পারে সামগ্রীর অভাবে অথবা সময়ের অভাবে। যেমন বাড়ির লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো, নারায়ণ পুজোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ভাবে সেবা পুজো করা যেতে পারে। যাঁরা বিশেষ করে বাড়ির বাইরে বা ভিন প্রদেশে থাকেন এবং অনেক সামগ্রী জোগাড় করে উঠতে পারেন না তাঁরা এই ভাবেও সরল পুজো করতে পারেন।

ধূপসেবা নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে বলে রাখি যে আমি বেনারসে এই প্রথাটি সম্পর্কে যখন জেনেছিলাম তখন যেমন এর সমর্থন অনেকের কাছে পেয়েছি আবার অনেক বিরোধও অনেকের কাছেই শুনেছি। অনেকে এটিকে দেবসেবা হিসাবে দেখতেই রাজি নন। আবার অনেকের কাছে সেবার কোনো নিয়ম হয় না, তা পুজোর

আঙ্গিকে হলেও সেবা প্রধানত মনের পুজোর অঙ্গ তাই যে-কোনো ভাবেই করা যায়। আসলে পুজোর কোনো একমাত্র বিধি বলে কিছুই হয় না কেউ লৌকিক কেউ বৈদিক কেউ তান্ত্রিক কেউ আবার পারিবারিক নিয়মে পুজো করে আসছেন এর কোনোটিকেই ভুল বলা যাবে না কারণ সবগুলির মধ্যে দেবতাকে কাছে পাওয়ার ভালোবাসার মাধ্যমই মূল। ধূপসেবা সেই অর্থে প্রাকার্য সময় থেকে চলে আসছে বা হয়তো বৈদিক পন্থীরা সেই ভাবে নির্দিষ্ট করেননি কিন্তু অনেক স্মৃতিতেই এই পদ্ধতির উল্লেখ আছে। তন্ত্রের আগম বিধিতেও ধূপ আরাধনার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বলার অর্থ কখনোই এটা নয় যে, কারুর চিরাচরিত পুজো বিধি বা বিশ্বাস বদলে ফেলা। কিন্তু অনেকেই আছেন সময়ের অভাবে পুজো বা দেবসেবা করতে পারেন না অথবা উৎসবের পুজোগুলিও করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে যদি এই ধূপসেবা বা ধূপ আরাধনা পদ্ধতি তাঁদের খানিকটা সংস্কৃতির সাথে জুড়ে থাকতে এবং সামান্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে তাতে ক্ষতির কিছু হয় বলে মনে হয় না। বরং শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথাই মনে পড়ে যায় যে, "দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিন্তু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্লে, তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। যদি কোনো মত আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধরিয়ে দেন।"

ধূপ জ্বালানোর নানা পদ্ধতি

ধূপ জ্বালানোর নানা পদ্ধতি আমাদের ভারতীয় সমাজে বহু প্রাচীন সময় থেকেই চলে আসছে। এর মধ্যে কিছু ধূপ পোড়ানোর চলন রয়েছে পুজোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেবসেবার ক্ষেত্রে আর কিছু ধূপ সাধারণত পোড়ানো হয়ে থাকে ঘরের নানা জীবানুনাশ ও বায়ুশুদ্ধির জন্য। এর মধ্যে নিম পাতা দিয়ে ধূপের কথা হয়তো অনেকেই আমরা শুনে থাকতে পারি। এই সব ধরনের ধূপের কথাই আমরা এখানে আলোচনা করব। তবে প্রথমেই বলি এই ধূপগুলির মধ্যে অনেকগুলি ধূপই কিন্তু ব্যবহার করা সম্ভব নয় কারণ বর্তমানে আমাদের সময়ের বড়োই অভাব কিছু ক্ষেত্রে সামগ্রীরও। তবে পুজো বা দেবসেবার ধূপের ক্ষেত্রে সবসময় ধুনো এবং গুগগুল ব্যবহার করা উচিত। কারণ গুগগুলকে যে-কোনো পুজোর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ধূপ বলা হয়েছে। তাই পুজোর ধূপের অন্য সুগন্ধী দ্রব্য অভাবে ধুনো সবসময় গুগগুল সহযোগে জ্বালানো উচিত।

গুগগুল ধূপ : গুগগুলকে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ধূপ বলা হয়েছে পুজোর ক্ষেত্রে। বিষ্ণু পুজো এবং শক্তি পুজো দুই ক্ষেত্রেই গুগগুলের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। সাধারণ নিত্য পুজোর ক্ষেত্রেও গুগগুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাতে গুগগুল ব্যবহার করার প্রচলন যদিও খানিকটা কম দেখা যায় তবে পদ্ধতি মেনে দুর্গাপুজো করেন যাঁরা বা কালীপুজো করে থাকেন ধূপ দানের ক্ষেত্রে গুগগুল তাঁরা ব্যবহার করবেনই।

ধুনো ধূপ : ধুনোর ধূপকে বলা হয়েছে নির্যাস ধূপ। সেই অর্থে গুগগুলও একই ধরনেরই কিন্তু গুগগুলকে সহজে গুঁড়ো করা যায় না যা ধুনোকে করা সম্ভব। ধুনোকে সুরধূপও বলা হয়েছে যার অর্থ দেবতাদের ধূপ। ধুনো জ্বালানোর চলন বাংলাতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল ভাগেও ধুনো জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। ধুনো জ্বালানোর ক্ষেত্রে সবসময় সঠিক গোটা ডেলা ধুনো বাজার থেকে কিনে এনে তা হামানদিস্তায় পিষে ব্যবহার করা। ধুনো কিন্তু যেমন নারকেলের ছোবড়া দিয়ে জ্বালানো যায় আবার ঘুঁটের মাধ্যমেও জ্বালানো যায়। তবে কখনোই কাগজ দিয়ে এটি জ্বালাবেন না কারণ এতে ধুনোর যে সুগন্ধি তা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়।

প্রয়োজনে সামান্য ঘি ব্যবহার করেও ধুনো জ্বালানো যেতে পারে, কেবল ধুনো দিয়ে ধুনুচি ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে।

কর্পূর ধূপ : কর্পূর আমরা আরতির সময় জ্বালিয়ে থাকি এটুকু আমরা জানি কিন্তু কর্পূর যে আসলে ধূপ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তা আমরা অনেকেই জানি না। আসলে কর্পূর জ্বালিয়ে কর্পূর দেখানোর অর্থ হল দেবতাকে কর্পূর ধূপ দেওয়া। বাংলায় কিন্তু যদি পুরানো পুজো পদ্ধতির দিকে দেখি সেখানে কিন্তু কর্পূর আরতির চলন ছিল না। কারণ মনে হয় ধুনুচি ধূপ আরতি করাই বাংলায় প্রচলিত বেশি। এই কথাটি বেনারসের এক বাঙালি পণ্ডিতের কাছেও শুনেছিলাম যে ধুনুচি ধূপ দিয়ে আরতি করলে সেখানে কর্পূর দিয়ে আরতি করবার প্রয়োজন হয় না। কারণ কর্পূর দীপ কথাটি সঠিক নয় কর্পূর আসলে ধূপ। ধুনুচি যদি কর্পূর দিয়েই জ্বালানো যায় তাহলে সবচেয়ে উত্তম হয় বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। কাগজের ব্যবহার না করে কর্পূর দিয়ে ধুনুচি ধূপ জ্বালানো অনেক বেশি সঠিক ও সুগন্ধবর্ধক।

সাদা সরষের ধূপ : সাধারণত বলা হয় যে ঘর থেকে কোনোরকম নেগেটিভ এনার্জিকে নষ্ট করার জন্য সাদা সরষে ব্যবহার করা হয়, সংস্কৃতে এটির নাম 'সিদ্ধার্থ'। ধুনোর মধ্যে ঘি ও সরষে সহযোগে এই ধূপ করা হয়ে থাকে। উত্তর ভারতের দিকে ছোটো বাচ্চাদের নজর দোষ কাটানোর জন্যও এই ভাবে ধূপ জ্বালানো হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কালো সরষের ব্যবহার কিন্তু করা যাবে না। এটিকে হলুদ সরষের ধূপ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দিতে বলা হয় 'পীলী সরসো ধূপ'। সাদা সরষে ধূপ বিশেষ দেব পূজোতেও বৈধ।

পঞ্চাঙ্গ ধূপ : নারকেলের ছোবড়ার মধ্যে কর্পূর দিয়ে জ্বালিয়ে তার মধ্যে ধুনো, গুগগুল, অগুরু, চন্দন, ঘি দিয়ে পঞ্চাঙ্গ ধূপ জ্বালানো হয়ে থাকে। এই ধূপ যে-কোনো সাধারণ পুজোতেই জ্বালানো যেতে পারে। অগুরুর বদলে বা না পাওয়া গেলে শর্করা অর্থাৎ গুড় বা মিছরিও ব্যবহার করা যায়।

গুড় ও ঘি ধূপ : ধুনো ও গুগলের সঙ্গে গুড় এবং ঘি সহযোগে ধূপ করলে তা উত্তম নৈবেদ্য ধূপ হয়ে থাকে। যেমন মিষ্টান্ন সহযোগে ভোগ দেওয়া হয় ঠিক সেই রকম প্রতিদিন গুড় ও ঘি মাধ্যমে ধূপায়িত করলে আলাদা করে নৈবেদ্য দান প্রয়োজন হয় না। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে নিত্য এই গুড় ঘি ধূপ করার প্রচলন আছে।

ষড়ঙ্গ ধূপ : এই ধূপের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সমস্ত দেবতাকেই এই ধূপ দেওয়া যেতে পারে তাদের প্রীতি বর্ধনের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে অগুরু, চন্দন, গুগগুল, শর্করা, মধু, ধুনা। যে-কোনো আরতি এবং যে-কোনো পুজোর ক্ষেত্রেই এই ধূপ উত্তম। তা আনুষ্ঠানিক এবং নিত্য যে-কোনো পুজোই হতে পারে।

সপ্ত ধূপ : বেনার মূল, চন্দন, গুগগুল, অগুরু, ধুনা, ঘি, শর্করা সহযোগে যে ধূপ

জ্বালানো হয়ে থাকে তা সপ্ত ধূপ। এটির কথা যদিও গ্রন্থে সেই ভাবে আলাদা করে বলা হয়নি তবে অনেক জায়গাতে সপ্ত ধূপ আরতি করা হয়ে থাকে। আসলে ষোলোটি ধূপের মধ্যে থেকে পাঁচ প্রকার সাত প্রকার ও নয় প্রকার ধূপ নিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে। যেমন অনেক জায়গায় নবরাত্রি আরাধনাতে নয় প্রকার ধূপের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অষ্টাঙ্গ ধূপ : এই ধূপ দিয়ে হোম অনুষ্ঠান বা ধূপহোম করা প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে উপযুক্ত। অর্থাৎ আট প্রকারের এই ধূপ দিয়ে যে-কোনো পুজোর ধূপ নিবেদন, ধূপ আরতি এবং ধূপহোম করা যেতে পারে। আসলে আজকাল বেশিরভাগের কাছেই সব রকমের ধূপ তৈরি করা সত্যি খুবই মুশকিলের কিন্তু এই আট প্রকারের ধূপ খুব সহজেই তৈরি করা যেতে পারে। এই অষ্টাঙ্গ ধূপের মধ্যে রয়েছে কর্পূর, অগুরু, চন্দন, গুগগুল, কেশর, সর্জরস, ঘি, সুগন্ধিত তেজপাতা। এর সঙ্গে মধু ও শর্করা অর্থাৎ আখের গুড় ব্যবহারও করা হয়ে থাকে।

দশাঙ্গ ধূপ : এই ধূপ প্রধানত দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত ধূপ মনে করা হয়ে থাকে। দুর্গা পুজো, কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজোর ক্ষেত্রে এই ধূপের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে মায়ের প্রীতিকামনায় বলা হয়েছে "দেব্যঃ মাতুর্দশাঙ্গদাহসুরভীর্ধূপঃ সদা বল্লভঃ"। দশাঙ্গ ধূপের মধ্যে রয়েছে মধু, শর্করা, ঘৃত, চন্দন, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, গুলগুল, ধুনো, জাতীফল। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সামগ্রী বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। তাই এই দশটির সামগ্রীর মধ্যে কিছু বাদ আবার কিছু যুক্তও হয়ে থাকে।

ষোড়শাঙ্গ ধূপ : এই ধূপকে পূর্ণ ধূপ বলা হয়েছে। ষোলো রকমের এই ধূপ দিয়ে ধূপ হোম করা হয়। সাথে এই ধূপ দেবতাকে নিবেদন ও আরতি করার ক্ষেত্রেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবেও দশাঙ্গ ধূপ ব্যবহার বেশি করা হয়ে থাকে কিন্তু ষোড়শ এই ধূপ দ্বারা ধূপ পুজো করলে ষোড়শ উপচারে পুজোর সমান ফল পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। আসলে এই ষোলোটি ধূপ দ্রব্যের মধ্যে থেকেই অষ্টাঙ্গ, দশাঙ্গ ধূপ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ষোড়শাঙ্গ ধূপের নানা সামগ্রী নিয়েও নানা জনের নানা মত। অনেক ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ও মাতৃপুজোতে সামগ্রী আলাদা হয়। তবে ষোলো রকমের সামগ্রী দিয়ে তৈরি যে ধূপ তাই হল ষোড়শাঙ্গ ধূপ। অগুরু, গুগগুল, ধুনো, দেবদারু, চন্দন, লাক্ষা, গুড়, ঘৃত, শর্করা, জটামাংসী, নখী, শতাবরী, শৈলজ, গন্ধসার, সরল গুগগুল, কর্পূর হল ষোড়শাঙ্গ সামগ্রী।

মহা ধূপ : দেবীপুজোর ক্ষেত্রে এই মহাধূপ করার প্রচলন রয়েছে। ধুনুচিতে অন্তত আটাশ রকমের ধূপ প্রজ্বলন করে এই মহাধূপ নিবেদন করা হয়ে থাকে। গুগগুল, ধুনো, অগুরু, চন্দন, শল্যকী, ঘৃত, মধু, উশীর, বেলফল, শর্করা, জটামাংসী,

দেবদারু, নখী, গুড়, শৈলজ, হ্রীবর, কুষ্ঠ, শতাবরী, পদ্মবীজ, দারুহলদী, বেলপত্র চূর্ণ, বচ, দারচিনি, তমালপত্র, নারিকেল, জাতীফল, বিষ্ণুকান্তা, রক্তচন্দন, নাগকেশর, গন্ধসার। এই হল অষ্টবিংশতি মহাধূপ। এছাড়া চৌষট্টি ও ১০৮ প্রকারের মহাধূপ করা হয়।

মাথায় রাখতে হবে যে ধূপ কখনোই এক সাথে চূর্ণ করা সঠিক নয় তাকে কেবল এক সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াই সঠিক মিশ্রণ পদ্ধতি। ধুনো বাদে অন্যান্য ধূপগুলি একেবারে চূর্ণ করে নিলে তা কিন্তু এক প্রকার কৃত্রিম ধূপের সমান হয়ে যায় তাই সম্পূর্ণ মিহি চূর্ণ না করে স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলির ব্যবহার করতে হবে। অষ্টাঙ্গ ধূপ ও ষড়ঙ্গ ধূপের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে গৃহস্থ পুজো বা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। দুর্গাপুজোতে দশাঙ্গ ধূপ সবচেয়ে উপযুক্ত তবে অষ্টাঙ্গ ধূপ ব্যবহারও উত্তম।

লোহবান ধূপ : অনেক প্রদেশেই লোহবানকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে এটি পারলৌকিক শক্তিকে জাগ্রত করে। এই ভাবনা যদিও ভ্রান্ত কারণ ধূপ-দীপ অগ্নির ব্যবহার নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে হয়ে থাকে। তাই কে ভালো কাজে তা ব্যবহার করবে আর কে খারাপ কাজে করবে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। ধূপ এবং অগ্নি জন্ম থেকে শুরু করে পুজো, ধর্মকার্য এবং শেষকৃত্য-শ্রাদ্ধাদিতেও ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার গৃহস্থের ধূপ ও দীপের যেমন ব্যবহার তান্ত্রিকদের ও সাধকদের কাছে তা আবার অন্য ভাবনা থেকে হয়ে থাকে। অনেকে আবার লোহবান ধূপকে মুসলিমদের ধূপ বলেন কিন্তু এটিও অযৌক্তিক কারণ ধূপ বা সুগন্ধদ্রব্য কোনো ব্যক্তিগত সম্প্রদায়ের হয় না, হয়তো তা কোনো সম্প্রদায় অধিক ব্যবহার করেন মাত্র। তবে যেহেতু লোহবানের আমদানি বাইরের দেশ থেকেই প্রধানত হয়ে থাকে তাই সাধারণ পুজোর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার তুলনায় কম। অনেকে আবার ধুনোকে লোহবান মনে করেন সেটিও কিন্তু ধূপ সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকার কারণেই।

ভেষজ ধূপ : দুটি ভেষজ ধূপের কথা এখানে না বললেই নয় তা হল নিমপাতার ধূপ এবং তার সঙ্গে তুলসী পাতার ধূপ। দুটি ক্ষেত্রেই পাতাগুলিকে ভালো করে শুখিয়ে নিয়ে তা ধুনোর মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধূপের গুণাগুণ হল এটাই যে এর ফলে ঘরে মশা মাছি এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব অনেকটাই কম থাকে। এখনকার দিনে আমরা অনেকেই যে সব কয়েল বা মশা তাড়ানোর ধূপ ব্যবহার করে থাকি তা দিয়ে হয়তো মশা কিছু তাড়ানো যেতে পারে কিন্তু তা আমাদের শরীরের অপকারও অনেকটাই করে থাকে। তাই যদি ওই ধরনের কৃত্রিম ধূপের পরিবর্তে ভেষজ এই ধূপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে তা শরীর এবং বাড়ির পরিবেশকেও অনেক বেশি বিশুদ্ধ রাখে।

ধূপ জ্বালানোর এই প্রথাগুলি আমাদের সনাতন ধর্মে অনেক প্রাচীন সময় থেকেই চলছে। যেহেতু আমরা সব কিছুই বেদ এবং পুরাণে খুঁজে থাকি তাই এই ধূপের বর্ণনা বেদ এবং পুরাণে সম্পূর্ণ ভাবেই আছে। কিন্তু এর বাইরেও আগম শাস্ত্র, বহু স্মৃতি শাস্ত্র, গৃহ্য সূত্রে ধূপ জ্বালানোর কথা বলা হয়েছে। আসলে ধূপ জ্বালানোর প্রথা বৈদিক সভ্যতার আগেই বিস্তার লাভ করেছিল কিন্তু তা ব্যাপক ভাবে প্রচার পেতে থাকে বৈদিক সময়ের পর থেকে। আসলে এতদিন অবধি যে সমস্ত ক্রিয়াগুলি ছিল অলিখিত ভাবে, বৈদিক সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রিয়াগুলি লিখিত হতে থাকে। বেদ যেমন শ্রুতি থেকে সেই রকম এই সাধারণ পুজো পদ্ধতিগুলিও ছিল অভ্যাসের মধ্যে সীমিত। ধীরে ধীরে ঋষিরা এই ক্রিয়াকে স্মৃতির আকারে সংরক্ষিত করতে থাকেন এবং পরবর্তীতে এগুলি পালিত হতে থাকে শাস্ত্রাচার হিসাবে। কিন্তু আর্য ঋষিদের দ্বারা এই ক্রিয়াগুলি লিখিত হলেও তা যে তার প্রাচীন প্রাকার্য স্বরূপ সম্পূর্ণ হারায়নি তা এখনো এই ধূপ দেওয়ার প্রথা দেখলেই বোঝা যায়। আসলে ভারতীয় যে-কোনো সাংস্কৃতিক আচারই এখানে আর্য এবং অনার্যদের মিশেলে গঠিত। তাই ধূপ প্রজ্জ্বলন ধূপ নিবেদন আরতি যেমন একদিকে তন্ত্র অর্থাৎ পুজো পদ্ধতি তেমন ধূপন ক্রিয়া বা ধুনো পোড়ানো অপর দিকে বৈদিক অগ্নিহোত্রর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যা নিত্য আমাদের আরাধনার অংশ।

আসলে আমরা পুঁথি জেনে, পদ্ধতি জেনে অনেক কিছু আওড়ে যে পুজো করার জন্য একপ্রকার ঝগড়াঝাটি করে থাকি এই বলে যে, আমাদের নিয়মই সঠিক এবং অপরেরটা সম্পূর্ণ সঠিক নয় বা অশাস্ত্রীয় তা কিন্তু আসলে একপ্রকার অহংকারের প্রকাশ মাত্র। যেন উপচারের মাধ্যমে জানা আর না জানার এক অদ্ভুত লড়াই প্রতিনিয়ত চলছে। এই নানা উপচারের পুজো করাকে ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ তাঁর কালীকীর্তনের মাধ্যমে বলেছেন জাঁকের পুজো। তাঁর গানের কথায় "জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে"। ভক্ত যখন ভগবানের সঙ্গে এক আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান তখন অনেক উপচার নয় তাঁর মনের ভালোবাসাই প্রধান হয়। ধূপ সেই নিষ্কাম প্রেম ও বৈরাগ্যের প্রতীক। ধূপ যেমন উত্তম বা অধম বিচার না করে সবার জন্যই সুগন্ধ বিলিয়ে দেয় নিজেকে পুড়িয়ে, প্রকৃত ভক্ত ঠিক এইরকম ভাবেই লোক কল্যাণের জন্য নিজেকে নিবেদন করে দেয়। ভালো মন্দ বিচার ঈশ্বরে সমর্পণ করে।

ধুনুচির ধূপের পবিত্র ধোঁয়া মনকে একাগ্র করে তোলে, আর একাগ্রতা না হলে ইষ্টলাভ হয় না। আসলে আমাদের সাধারণের পক্ষে জপ, ধ্যান বা অন্য ক্রিয়া করে মনকে সবসময় একাগ্র রাখা সম্ভব নয় তাই এই ধূপসেবা বা বলা ভালো যজ্ঞ ধূপ সাধনার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের মতো করেই ঈশ্বরকে খানিক অনুভব করা বা তাঁকে পাওয়া তাঁর প্রতি মনকে বেঁধে রাখা দিনের সব কিছুর মধ্যে বা দিনের শেষে।

ধূপের ভক্তি আরাধনা

ধূপ আরাধনা সহজ পুজোর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। আমরা আসলে শাস্ত্র, লোকাচার, আচার, নিয়ম, বিধি, বৈদিকতা, পৌরাণিকতাকে যত গুরুত্ব দিয়ে থাকি ভক্তি ও প্রেমকে কিন্তু সেই অর্থে গুরুত্ব দিতে পারি না। পুজো বা নিত্য পুজো বা বাৎসরিক অনুষ্ঠান বলতে গেলে একপ্রকার অভ্যাস যা আমরা প্রতিদিন বা বছর-কে বছর করে আসছি কিন্তু এর মধ্যে আদৌ কি আমাদের ভক্তি ভাবনার প্রকাশ ঘটে? আমি এখানে ভক্তি নিয়ে যখন বলতে বসেছি তার অর্থ এটা নয় যে, আমি ভক্তির বিষয়টি খুবই ভালো বুঝে ফেলেছি। বরং আমিও যে এই অভ্যাসেই আবদ্ধ তা এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আরো যেন বেশি করে অনুভব করছি। একাজের সূত্রেই সারদা জননী বিষয়ক একটি বই পড়তে পড়তে একটি কথা খুব মন ছুঁয়ে গিয়েছিল তা হল যে, মন্ত্র তন্ত্র শাস্ত্র পথ কিছুই কিছু না আসল হল ভালোবাসা, আড়ম্বরতা নিয়ম কানুন নয় ভগবান মানুষের ভালোবাসার কাঙাল। এই ভাবনাটি যেন ধূপ আরাধনার এক সুন্দর উদাহরণ মনে হল। আসলে লেখার কাজটি ভগবান নিজেই তাঁর মতো করে খুঁজিয়ে নেন বাকিটা কাগজে লিপিবদ্ধ করার জন্য কাউকে মাধ্যম করেন মাত্র। ধূপ যখন আমরা প্রজ্জ্বলন করে থাকি সাধারণত আমাদের প্রাদেশিক রীতি অনুযায়ী নারকেলের ছোবড়াতে অগ্নি সংযোগ করি ধুনো ও গুগগুল দিয়ে। এই প্রজ্জ্বলনের মধ্যে যেন সব রকম অহংকার পুড়ে গিয়ে বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সুগন্ধি ধোঁয়া দেবতার চরণে নিবেদিত হয়। এই ধোঁয়া যেন মনের পবিত্রতার, আত্মশুদ্ধির। সমস্ত অজ্ঞানের অহংকার অবিদ্যা পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে যায়। তাই এই ধূপের পবিত্র ধোঁয়া হল বৈরাগ্য ও ভক্তিরসের প্রতীক যা কেবল মনে করায় অন্য সব কিছু বাহ্যিক কেবল ঈশ্বর ভক্তিই পরম সত্য।

ধূপ যেহেতু চিরকালই সাধারণ পুজো পদ্ধতির অংশ ছিল তা পূর্বভারতের প্রচলিত একটি বিধি নিয়ম নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয়তো বোঝা অনেক সহজ হবে। আসলে অনেক বেশি নিয়ম আচারের বাঁধনে ভক্তি কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কিছু শতক আগেও শূদ্রদের জন্য দেব-অর্চন পদ্ধতি ছিল কেবল মাত্রই প্রণাম, বৈশ্যের

ছিল ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজোর অধিকার, কায়স্থের ছিল লুচি ভোগ দেবার অধিকার আর ব্রাহ্মণদের ছিল অন্নভোগ দেবার অধিকার। তবে ভোগ রান্না করতে গেলেও তাঁর উপবীত থাকতে হবে তাই মহিলারা অনেকটাই বঞ্চিত ছিল সেই সেবা থেকে। এই ধূপের পুজোকে শূদ্র বা বৈশ্যের পুজো না বলে সাধারণের পুজো বলার সার্থকতা এখানেই যে পুজোর নিয়ম আচার যেসব সাধারণ মানুষের বোধগম্য হত না তাঁরাও এই ধূপ-ধুনো দেখিয়ে একপ্রকার আরতি করে বা বিশেষ পুজোর দিনে ধুনো পুড়িয়ে পুজো করতে পারেন। ধুনো পোড়ানোর বিষয়ে এখানে একটা কথা বলি যে, এখনও কিন্তু বেনে বাড়িতেই এই নিয়ম বেশি দেখা যায় ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বাড়ির তুলনায়। মনে হয় ধূপ-ধুনো পুজো করার অধিকারের লৌকিক দিকটা এই বৈশ্য পরিবারগুলি তাঁদের পরিবারের ঐতিহ্য রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন। এর কারণ সম্ভবত ব্যবসা এবং ধনের প্রতিপত্তির জন্য তথাকথিত উঁচু শ্রেণির লোকেরাও এতে সেইভাবে আপত্তি করেননি। পরবর্তীতে শূদ্রদের বাড়িতেও এই ধুনো পোড়ানোর বেশ ভালো প্রচলন দেখা যায়। আসলে ধূপের পুজো যেহেতু লৌকিক পুজোর অংশ তাই এটি পরবর্তীতে বৈদিক ও পৌরাণিক পুজোয় ব্যবহার করা হলেও এটির স্বতন্ত্র পুজো করার অভ্যাসটি সম্পূর্ণ বদলে ফেলা সম্ভব হয়নি। তাই ধূপ নিবেদন আরতির যেমন বিশেষ মন্ত্র রয়েছে আবার ধুনো পোড়ানোরও রয়েছে মঙ্গল প্রার্থনা। বর্তমানে সর্বজনীন পুজোতেও ধুনো পোড়ানোর চলন বেড়েছে।

ধূপের ভক্তি আরাধনার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে এখানে আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু বলে রাখি। বাঁকুড়া জেলার এক দুর্গা মন্দিরের পুরোহিতের কথায় 'মাকে যা দিয়ে প্রতিদিন পুজো করা বা সেবা দেওয়া যাবে সেটাই করা উচিত, একদিন মাছ ভাত, একদিন ডাল ভাত একদিন জল বাতাসা এটা কখনোই সঠিক নয় যা দিয়ে আমরা প্রতিদিন পুজো দিতে পারব তা দিয়েই করা উচিত তা সে শুধু পানীয় আচমনীয় জল টুকুনি দিয়ে ধূপ-দীপ দিয়ে আরতি করা হলে তাই'। পুজোর কোনো উপচারের অভাবে কিন্তু ধূপ (গন্ধ), ফুল, জলে পুজো সম্পূর্ণ বৈধ এটিকেও তিনি খুবই সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছিলেন যা শাস্ত্রীয় ভাবেও একদম সঠিক। তাঁর কথায় প্রতিদিন একরকমভাবে সেবা না দিতে পারলে তাতে কোনো ফল হয় না তার জন্য আড়ম্বরের দরকার হয় না কিন্তু ধারাবাহিকতার প্রয়োজন তা সে যত সামান্য উপচারেই হোক না কেন। আসলে ধূপ- ধুনো এগুলো সহজেই স্টোর করে মানে গুছিয়ে সংগ্রহ করে রাখা যায় বহু দিন এমনকি বর্ষা বা খরাতে সামগ্রী না পাওয়া গেলেও এই ধূপ আরাধনা করতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে এই ধূপ দেবধূপঃ (সুরধূপ) হওয়াই প্রয়োজন, নইলে তা পুজোর জন্য গ্রাহ্য হবে না।

অনেকের মতে পুজো-আচ্চার ক্ষেত্রে একসময় ব্রাহ্মণরাই একচেটিয়া আধিপত্য

করে গিয়েছেন। এখানে এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ সঠিক মনে হয় না। মনে হয় আমরা মানুষের ভয়-ভক্তির দিকটি এই বিষয়ে যত বিচার করেছি প্রেম-ভক্তির দিকটি সেই ভাবে বিচার করিনি। তবে এই দু-দলের মানুষ এখনও আছে বরং আমি বলব ভয়ে ভক্তি করা বা পাইয়ে দেওয়ায় ভক্তি করার মানুষের সংখ্যা বর্তমানে বাড়ছে, এর খানিকটা কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বলা চলে। তবে প্রেম-ভক্তি বা ভগবানকে ভালোবেসে নিজের মতো ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে পুজো করে আরতি করা মানুষের সন্ধান যে আজ একেবারেই পাব না তা কিন্তু নয়। চিরকালই এই ধরনের মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কম, যাঁদের নিজের আরাধ্যকে নিজের মতো করে পুজো করার ইচ্ছা মনের মধ্যে হয়েছে এবং তাঁরা তথাকথিত নিয়ম আচারকে না মেনেও সহজ সরল ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে গিয়েছেন তা সে ধূপ আরাধনা হোক, আরাত্রিক আরাধনা বা সংগীত ভজন আরাধনা যাই হোক।

নদিয়ার শান্তিপুর এবং নবদ্বীপ বরাবরই ছিল বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তির কেন্দ্র। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে থেকেই এখানে ছিল কৃষ্ণ আরাধনার সহজ এবং সরল পদ্ধতি। আসলে গৃহস্থ বৈষ্ণবদের ধর্ম ছিল সরল পুজো পদ্ধতির ধর্ম এবং যে কেউ এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারত, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না এমনকি তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যাঁদের অচ্ছুৎ করে রাখা হত সেই নিচু জাতের মানুষেরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে নাম সংকীর্তনে ও ধূপ সেবায় নিজেদের মতো করে পুজো করতে পারতেন কোনো বাধা এক্ষেত্রে ছিল না। বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্টই ছিল এটি যে, নিজের মতো করে নিজের ইষ্টকে পুজো করা, তা সে কেবল চন্দন পুষ্পেই বা ধূপেই হোক না কেন। আসলে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ভালোবাসাই ছিল বৈষ্ণবধর্মের মূল; কঠিন নিয়ম বা শাস্ত্রাচার নয়। তাই বৈষ্ণব ভাবনার সঙ্গে এই ধূপ আরাধনার এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ভোগ দেবার সামর্থ্য যে সবার ছিল তা নয় এবং বৈষ্ণব সমাজে ভোগ দানের ক্ষেত্রেও যে কিছু বিধি নিষেধ ছিল না সবটাই খুব উদার ছিল এমনও নয় কিন্তু ধূপ সেবা বা দেবতাকে সুগন্ধী দিয়ে পুজো করা যাকে বাংলা ও উৎকল প্রদেশে বিষ্ণুভক্তরা ধূপ-বিলাস বলে থাকেন তা কিন্তু এক ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। এই সহজ পুজো পদ্ধতির বীজ বপন শুরু হয়ে গিয়েছিল বহু পূর্বেই, মহাপ্রভু তাই পরবর্তীতে সরল প্রেমভক্তি রসে নামসংকীর্তনে সকলকে একত্র করতে পেরেছিলেন। কারণ কঠিন শাস্ত্রাচার শুকনো জ্ঞান মাত্র, কিন্তু চন্দন, ফুল, ধূপের সুবাস ধূপ-ধুনোর সুগন্ধি আরতি প্রদীপের জ্যোতি আরতি সঙ্গে নামগান অহেতুক অফুরন্ত আনন্দের প্রতীক। যদি বৈষ্ণব স্মৃতিগুলি খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করি তাহলে কিন্তু দেখে থাকব যে এই সেবাভাবের উপরই গৃহস্থ বৈষ্ণবদের জোর দিতে বলা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীমন্দির মার্জন, ধূপদান, ধূপ-দীপ আরতির কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। "ধূপজ্ঞ বীজনে

চৈব ধূপেনাঙ্গবিধূপনে। নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ।" অর্থাৎ ধূপ দিয়ে বায়ু শুদ্ধিকরণ কালে শ্রীহরির নামসংকীর্তন করিয়া আরাত্রিক করা প্রয়োজন। আসলে সকলের পক্ষে নানা অন্ন, ব্যঞ্জন, মিঠাই দিয়ে সেবা করা সম্ভব নয় কিন্তু ঈশ্বর তো সবার তাই যা সকলে সরলভাবে প্রতিদিন করতে পারবে তার বিস্তারিতে অধিক আলোকপাত করা হয়েছে।

তবে আমরা বৈষ্ণব ভাবনার কথা বলতে গিয়ে যদি শাক্ত ভাবনাকে সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়ে থাকি তবে খুবই ভুল করব। শাক্ত আরাধনা হল সাধনা, তা সে গৃহস্থই করুক আর সন্ন্যাসী বা তন্ত্রসাধকই করুক। শাক্ত ভাবনায় মাকে নিরামিষ ভোগ না আমিষ ভোগ দেওয়া হবে এগুলি অনেক পরের বিষয়। শাক্ত আরাধকরা মনে করেন মা ব্রহ্মময়ী নিরাকার সত্য, তাই সাকার রূপেও নিরাকার তত্ত্ব দিয়ে মায়ের আরাধনাই হল শ্রেষ্ঠ আরাধনা। পঞ্চবায়ু রূপ ধূপ হল সবচেয়ে শুদ্ধ তত্ত্ব কারণ তা দিয়ে অগ্নিশুদ্ধির সাথে পঞ্চদীপ আরতির মাধ্যমে পঞ্চ ইন্দ্রিয় মাকে প্রদান করা হয়। অনেক শাক্ত সাধকদের কথায় যার মধ্যে অগ্নি রয়েছে তাই হল দেবী পুজোর প্রধান উপচার কারণ মা অগ্নি স্বরূপা কুমারী, তবে মা যেহেতু অন্নপূর্ণাও তাই খাদ্যের প্রতীক হিসাবে মাকে আমরা ভোগ নিবেদনও করে থাকি যাতে মায়ের সন্তানেরা মায়ের ভোগ গ্রহণ করে দুধে ভাতে থাকতে পারে। দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপুজা পদ্ধতির ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রেও তাই ধূপের সুগন্ধিত ধূম্র (ধোঁয়াকে) দেবতাদের ভোজন বলা হয়েছে "ওঁ বনস্পতি রসোদিব্য গন্ধর্বা সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"। রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘ জননী মা সারদা এই ভোগ দেওয়া নিয়ে বলেছিলেন যে ঠাকুর তাঁর সন্তানদের মুখে খান, তাই ঠাকুরের পছন্দের সিদ্ধ চালের খিচুড়ি আর মাছ ভোগ দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিতে আদেশ করেছিলেন কোয়ালপাড়া মঠে। আসলে প্রসাদ রূপ খাদ্য থেকেই শরীরের পুষ্টি সম্ভব কারণ শরীর না থাকলে ঈশ্বরের নাম করাও সুস্থ মনে সম্ভব হবে না। দেবতাকে এই মানবায়নের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের খাবার খাওয়ানো বিষয়টাই এক প্রথা এবং অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে গিয়েছে ধীরে ধীরে, যাতে আমার সাধারণ মানুষেরা ঠাকুরের নাম নিয়ে একটু ভালোমন্দ খিচুড়ি লাবড়া মুখে তুলতে পারি। আর এই ভক্তের ভোজনেই বোধহয় দেবতার প্রকৃত তৃপ্তি। শক্তি পুজোর ক্ষেত্রে ধূপের বিষয়েও বলা হয়েছে যে যদি ধূপের সুবাস নিজে আগে নিয়ে মাকে তার মাধ্যমে আঘ্রায়িত করা হয় তাহলে তা দেবী কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। কালিকাপুরাণ অনুসারে তাই বলা হয়েছে "পুষ্পং ধূপঞ্চ গন্ধঞ্চ উপচারাংস্তথা পরান্। ঘ্রাত্বা নিবেদ্য দেবেভ্যো নরোনরকমাপ্নুয়াৎ।"। আসলে ধূপের সুবাস দেবী মহামায়াকে হবি রূপে নিবেদন করে নীরাজন করে প্রসাদী ধূপশেষ গ্রহণ করলে দেবীর কৃপাধন্য হওয়া যায়। এই ধূপ মাহাত্ম্য মনে হয় দেবীর প্রীতিকামনার

জন্য এবং সহজভাবে নিষ্ঠা সহকারে দেবীর আরাধনা করার দিকে লক্ষ রেখেই বলা হয়েছে। আমরা যদি আজও বাংলার দেবীপুজোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব এই ধূপ আরাধনায় বাংলার সব শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করে। পূজারি ব্রাহ্মণ যেমন পুজো করেন অব্রাহ্মণরাও কিন্তু ধুনো পুড়িয়ে, ধূপ আরতি করে ধূপ আরতি নৃত্য করে দেবীকে আনন্দ প্রদান করে থাকেন।

ধূপ পুজোকে বলা হয়েছে তাই সমন্বয়ের পুজো। এখানে কোনো বাধা নেই নিষেধ নেই যে কেউ চাইলেই এই পুজো করতে পারেন। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ দীক্ষিত অদীক্ষিত এই ভাবনা এখানে আসে না, ভক্তির ধূপ নিবেদনই এখানে প্রধান। আসলে দেবতা কোনো কিছুতেই ভেদভাব করেন না কিন্তু আমরা সামাজিক ভাবে কিছু জাতিমূলক সম্প্রদায়মূলক ভেদভাব করে দেবতাকেও সেই ভেদভাবের শরিক করার চেষ্টা করি। তবে এখানে বলে রাখি যদিও কয়েকজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিছু অধিকার মানুষের থেকে কেড়ে নিয়েছেন অন্যদিকে অনেক ব্রাহ্মণই আজীবন সাধারণ মানুষের পুজো আরাধনার সাধারণ সরল রাস্তাটি মসৃণ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। এই ধূপ অর্চন এবং ধূপ-দীপ আরতি সেই ভাবনারই ধারাবাহিকতা বহন করে চলেছে। আজ ব্যস্ত সময়ের মধ্যে কঠিন নিয়মের বেড়াজাল যখন ভাঙছে যখন শুধু মাত্র স্বজাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে আস্তে আস্তে তখন এই ধূপ-অর্চন আরতি এক বড়ো প্রেক্ষপট নিচ্ছে। আসলে এখনকার এই ছুটে চলার জীবনযুদ্ধে সেই নিয়মগুলিই টিকে থাকবে যা সহজ সরল ভাবে সবাই পালন করতে পারে যা সাধারণের। এই গন্ধ, পুষ্পে বা বলা ভালো সচন্দন পুষ্পে ও ধূপে পুজোই আজ আমাদের পুজো পদ্ধতিকে যত্ন সহকারে টিকিয়ে রাখবে। কারণ এটি তার প্রাচীনতার সঙ্গেই বর্তমান এবং তার সঙ্গে বিদ্যমান আগামীও। আসলে ধূপ আরাধনার বৈশিষ্ট এটাই যে এটি সমাজে সর্বজনীনতা পেয়েছে তাই এর আরাধনার মধ্যে কোনো ভেদ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন এই ধূপ-পুজো পদ্ধতি বা আরতি এখনও সর্ব সাধারণের কাছে তাই প্রাণের পুজো, অন্তরের নিবেদন। কেবল শুকনো শাস্ত্রাচার তাকে সীমায় বাঁধতে পারেনি। এই নানা মত নানা পুজো পদ্ধতির মধ্যে এই ধূপ সেবা-পুজো-আরতি হল নিজের পুজো নিজে করা।

ভোগারতি এবং ধূপারতি

আগেই আমরা ধূপ সেবা নিয়ে অনেকটাই আলোচনা করেছি কিন্তু এখানে আমরা দেবতাকে ভোগ নিবেদন এবং ধূপ নিবেদন আরতির কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনায় যাব। আসলে ধূপ এবং ভোগ দুটিই দেবতারা ঘ্রাণের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকেন বলেই আমরা বিশ্বাস করে থাকি। ধূপ হল প্রত্যক্ষ নৈবেদ্য এবং ভোগ হল পরোক্ষ নিবেদন। আসলে ভোগ নিবেদন করে তা ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসাবে বন্টনের মাধ্যমেই ভোগ নিবেদনের সম্পূর্ণতা। কিন্তু এই ভোগ নিবেদন খুব প্রাচীন বলে অনেক পুজো পদ্ধতি বিশেষজ্ঞই মানতে নারাজ কারণ আমাদের আদি পুজোর ধারণা যদি দেখি তাহলে তা ছিল মন্ত্রহীন ধূপ-দীপ আরাধনা অর্থাৎ ধূপের সুগন্ধে দেবতার বিনোদন করা ও দীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করা ও একপ্রকার আরতি আরাধনা (তামিল ভাষায় এটিকেই আরাধনই বলা হয়েছে), এর পর বৈদিক সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মন্ত্রপূত আহুতি ও হোমসামগ্রী দিয়ে হোমক্রিয়া ও যজ্ঞ ক্রিয়া এবং তারপর ধীরে ধীরে যত মানুষের সমাজ গৃহস্থ পুজো পদ্ধতির অন্তর্গত হতে থাকে ও ভক্তিবাদের জোয়ার আসতে শুরু করে তখন দেবতাকে নিজের মতো স্নান করানো, ভোগ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এগুলির এক লৌকিক ধারা চালু হতে থাকে যা ধীরে ধীরে তথাকথিত শাস্ত্র আচারের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। কারণ কোনো নিয়ম যখন সংস্কৃত হতে থাকে ততই তার মধ্যে সমসাময়িক নতুন গুণ যুক্ত হতে থাকে। আমাদের বর্তমান শাস্ত্রাচার তাই সেই আদি ক্রিয়া (তন্ত্র) ও মৌখিক, লৌকিকতার সাথে বৈদিক ও পৌরাণিক মতের মাধ্যমে মিলে মিশে গিয়েছে।

নিত্য ভোগ প্রচলনের বিষয় নিয়েও অনেকের অনেক দ্বিমত রয়েছে। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যতজনের সাথেই কথা বলেছি তাঁরা একইরকম উত্তর কেউ দিতে পারেননি। তবে এখানে বলে রাখি যে কারুর ধারণাই কিন্তু সেই অর্থে ভুল বলে মনে হয়নি, শুধু মাত্র ভাবনার পার্থক্য মাত্র। আসলে আমাদের সাধারণের নিত্য পুজোতে ভোগ বলতে নির্দিষ্ট কিছু নেই তার বদলে আমরা মিছরির দানা বা বাতাসা একখণ্ড দিয়ে থাকি মাত্র যা কিনা প্রতীকী। কিন্তু ধূপের ব্যবহার কিন্তু সকাল সন্ধ্যা এমনকি

তিনবারও করে থাকি অনেকেই। আধুনিকতার জন্য যদিও ধুনুচি ধূপের জায়গায় সুগন্ধি ধূপকাঠি এসেছে যেটি কিনা দেব-ধূপই নয় আসলে। আমার ঠাকুমাদের সময়কালের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখেছি তিনবার ধুনো দেওয়ার চলন তখন ছিল কিন্তু ওই ভোগ বা বাতাসা নকুলদানা যাই হোক একবার দেওয়া হত মাত্র। তাহলে কি ধূপারতি প্রাচীন আর ভোগারতি আধুনিক! আসলে ধূপ আরাধনা যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে যেমন কোনো সন্দেহ নেই তেমন এটিও নয় যে ভোগ দান বিষয়টি নতুন। ভোগ আরতি করার প্রচলন বৈষ্ণব ভক্তি ধারার কারণে অনেক বেশি প্রচলিত হয়েছে যার ফলে ভোগ দান বিষয়টি সর্বসাধারণের কাছে অনেক বেশি সহজ সরল হয়েছে। মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভাবে কেবল আরতি মাধ্যমেই ভোগ নিবেদন। বলা হয় কৃষ্ণপ্রিয়া মীরাবাঈ এই রীতির সরলীকরণ করেছিলেন কারণ তিনি নিজে রাজপুতানী হয়েও নিজে ভোগ রান্না করে নিবেদন করতেন আর ভজন আরতি করে তাঁর গিরিধর গোপালকে খাওয়াতেন। আসলে ভোগ দান বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছেই সংরক্ষিত ছিল বহুকাল এমনকি এখনও, যা কিনা ধূপের ক্ষেত্রে কোনো কালেই করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ মনে হয় ধূপ আদি পুজো পদ্ধতি ছিল যার উপাদান ছিল প্রাকৃতিক বনস্পতি বস্তু কিন্তু ভোগ নিবেদন মানব সহায়তায় তৈরি করে তবেই নিবেদন করতে হত। এখনও বহু মন্দিরেই বা বাড়িতে ভোগ দেওয়ার সময়কে সকাল ধূপ, মধ্যাহ্ন ধূপ, বৈকালী ধূপ, সন্ধ্যা ধূপ এই ভাবে বলা হয়ে থাকে। মনে হয় পরবর্তীতে ভোগ দেওয়ার প্রচলন অধিক মাত্রায় হলেও প্রতি প্রহরে ধূপ আরাধনা বা আরতি করার ভাবনাটি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি, তাই ভোগ দানের সঙ্গে সঙ্গে ধূপ-দীপ আরতি তো থেকেই গেলো সঙ্গে থেকে গেলো সম্বোধনটিও। এখনও পূর্ব ভারতের অনেক মন্দিরেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভোগ দেওয়ার সময়কে তাই 'ধূপ' বলা হয়। ধূপ আরাধনা যে অনেক প্রাচীন এবং সনাতন তা এই আচারগুলি থেকে এখনও বোঝা যায় সহজেই। অনেকেই মনে করেন যে সনাতন সংস্কৃতির শুরু বেদের সময় থেকে কিন্তু তা সম্পূর্ণ সঠিক নয় কারণ আমাদের আরাধনা পদ্ধতির ইতিহাস অনেক প্রাচীন এবং এটিকে অনার্য না বলে সনাতন বলাই অনেক বেশি সঠিক। তবে এ বিষয়টি একেবারেই সত্যি যে বেদ এবং বৈদিক সভ্যতা থেকেই আমাদের সংস্কৃতি লিখিত আকারে এবং আরো ব্যাপক অর্থে সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল নইলে হয়তো আজও কেবল অভ্যাসের মধ্যেই তা থাকত এবং অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যেত। কারণ লিখিত আকারে কোনো পদ্ধতি ইতিহাস ও সাহিত্য সংরক্ষিত না হলে তা সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না। কিন্তু অভ্যাস ছাড়াও কোনো ক্রিয়াই সম্পূর্ণতা পায় না যেমন ধূপ এবং দীপ আরাধনা, যা আজও নিজের পুজো নিজে

করার অভ্যাসের মধ্যেই সজীব হয়ে রয়েছে। এই প্রাচীন অভ্যাসের পদ্ধতিকে বেদও তাই মন্ত্রে বিশেষ স্থান দিয়েছে।

ধূপপাত্র দেবতার বামে বা সম্মুখে স্থাপন করাই কিন্তু ধূপ নিবেদনের আরতির ক্ষেত্রে বিধেয়। এবিষয়ে বলা হয়েছে "বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে"। দুটি ধুনুচি ব্যবহার করে ধূপদান করলে পূজা ধূপ নিবেদনেরটি দেবতার বামে ও আরতিরটি অগ্রে নিবেদনই শ্রেয়। একটির ক্ষেত্রে অগ্রে রাখাই ভালো। এবার ধূপ আরতি এবং ভোগ আরতির কিছু বর্ণনা দেব যাতে বিষয়টি পাঠকদের কাছে ভালোভাবে পরিষ্কার হবে। ধূপ সেবা এবং ভোগ সেবার মধ্যেও ধূপ আরতি আমি যতটুকু দেখেছি এবং জেনেছি সেটিই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ধূপ সেবা নিয়ে যদিও আগেই আলোচনা করেছি কিন্তু এখানে দুটি বিষয় বোঝানোর জন্যই উল্লেখ প্রয়োজন। ধূপ সেবার জন্য কিন্তু দুটি ধুনুচি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে একটি জ্বালানো থাকে অপরটি এবং পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে। মঙ্গল ধূপের মাধ্যমেই দেবতার প্রথম ধূপ করা হয়, এরপর পূর্বাহ্নে গন্ধ, পুষ্প, ধূপে পুজোর পর একবার ধূপ-দীপ সহকারে আরতি, মধ্যাহ্নে আবার মধ্যাহ্ন আরতি এরপর বৈকালে উত্থান ধূপ আরতি ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি। এ বিষয়ে একজন পুরোহিতের কথায় ঘটে পটে ও বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিতে এই ধূপ সেবা আরতি করা হবে কেবল। বাড়ির মূর্তির আলাদা করে কোনো শাস্ত্রীয় প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না বলেই তিনি জানিয়েছিলেন যদিও এ নিয়ে দ্বিমত আছে তাঁর কথায় সেটিও স্পষ্ট ছিল। বহু মন্দির নিয়মাবলির মধ্যে প্রাচীন ধূপ সেবা পদ্ধতিকে বাদ না দিয়েই ভোগ দান প্রথার প্রচলন করা হয়েছে। এটির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষণীয় কিন্তু প্রাচীন আরাধনা পদ্ধতিকেও সম্পূর্ণ অবহেলা করা সম্ভব হয়নি তাই সকাল-ধূপ বা মধ্যাহ্ন-ধূপ ভোগের চলন। ভোরে মঙ্গলআরতির বা ধূপ-আরতির সময় জল, মিছরি, মাখন এইসব ভোগ দিয়ে মঙ্গল-ধূপ ভোগ। মঙ্গল-ধূপ বা আরতির সময় এটি দেওয়া হয় বলে এই নাম। আবার সকাল-ধূপ ভোগ অর্থাৎ পূর্বাহ্নের পুজোর পর যে ভোগ দিয়ে ধূপ-দীপ সহ আরতি করা হয়। মধ্যাহ্ন-ধূপ ভোগের মাধ্যমে অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়ে দেব সেবা ও ধূপ দীপ আরতি। বিকালে বৈকালি-ধূপ ভোগ, ফল ভোগ দিয়ে ধূপ-দীপ আরতি। সন্ধ্যা-ধূপ ভোগ যা কিনা সন্ধ্যাকালীন ধূপ-দীপ আরতির পরে দেবতাকে দেওয়া হয় কোথাও কোথাও আগেও দেওয়া হয়। এইগুলি থেকে আরেকটি বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে ধূপ-দীপ আরতিই কিন্তু মূল আরতি, বাকি উপাদানগুলি আরতির অঙ্গ হলেও তা পরে সংযোজন হয়েছে। এই সংযোজনের বিষয়ে বৈষ্ণব প্রভাব অনেক বেশি। আসলে দেবতাকে অনুভব করার সবচেয়ে সহজ এবং সরল মাধ্যম হল সুগন্ধ কিন্তু মানুষের খালি পেটে ভক্তি ধর্ম কিছুই হয় না। তাই এই ধূপ

আরাধনা পদ্ধতি তখনি টিকিয়ে রাখা সম্ভব যখন মানুষ অন্তত এক বেলা পেট ভরে খেতে পারে। তাই ধূপ আরতির সঙ্গে ভোগকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গাতেই প্রতিবার ভোগ দেওয়া হয় না কেবল সকাল-ধূপ বা মধ্যাহ্ন-ধূপেই ভোগ নিবেদন করা হয়, যাতে মানুষ অন্তত এই ভোগ প্রসাদ খেয়ে নিজের ক্ষিদে নিবারণ করতে পারেন। এই দুই ধরনের আরাধনা পদ্ধতি আপনি সবচেয়ে ভালো দেখতে পাবেন কাশীতে তবে শ্রীক্ষেত্রেও এই নিয়ম পালন করা হয়ে থাকে।

বেনারসের এক অখ্যাত বাঙালি প্রতিষ্ঠিত অনামী দুর্গা মন্দিরে কীভাবে দুশো বছর ধরে দুর্গাপুজো হয়ে চলেছে তাই দিয়েই এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব। মন্দিরটি কোনো এক বাঙালি গন্ধবণিকের তৈরি বলে জানা যায়। ব্যবসার জন্য বারাণসীতে থাকাকালীন তিনি এই মন্দির নির্মাণ করে মায়ের পুজো করতেন, তবে বৈশ্যের মন্দির বলে ভোগ নিবেদন করা সম্ভব নয় দেবীকে। ধূপ-ধুনো এবং আরতি দিয়েই প্রতিদিন আরাধনা হয়ে চলেছে এই দেবীর। অনেকের মতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেও ব্রাহ্মণ নির্দেশে ভোগ নিবেদন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যেহেতু মন্দিরে দেবীকে পুজো করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন তাই শেষ পর্যন্ত এই ধূপসেবা ও আরতি দিয়েই পুজো শুরু করেন। এই প্রথাই এখনও চলে আসছে এই মন্দিরে। দুর্গাষ্টমীর দিন এখানে দেবীকে দেওয়া হয় কাশীর চিনি ভোগ। এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে শূদ্রাণী হওয়াতে রানী রাসমণি তবে ভোগ না দিয়ে ধূপ সেবায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই পারতেন। আসলে রানী রাসমণি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন নিজের ইচ্ছায় নয় মায়ের স্বপ্নাদেশে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগ দেওয়াই ছিল মায়ের আদেশ। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, বাসন্তী পুজো সবই রানী রাসমণির জানবাজারের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হত কিন্তু সেখানে অন্নভোগ দেওয়ার প্রচলন ছিল না কোনোদিনই। নিজে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে যেভাবে পুজো করার ইচ্ছা বা সংকল্প নেওয়া হয় সেই ভাবেই পুজো চালানো যায় কিন্তু দেবীর আদেশ পেলে তা পালন করাই সঠিক কর্তব্য হয়ে ওঠে তখন। কাশীর এই দুর্গা মন্দিরে দেবীকে মঙ্গল আরতির সময় ধুনা, গুগগুল, ঘি সহযোগে ধূপ নিবেদন করা হয়। পূর্বাহ্ণ পুজোর সময় ধুনা, গুগগুল, ঘি, একইভাবে নিবেদন করা হয়। মধ্যাহ্নে মা অন্নপূর্ণার ভোগ আরতির পর করা হয় ধূপ আরতি। সন্ধ্যায় আবার মাকে আরতি করা হয়। এখানে তামার ঘটিতে মাকে আচমনের জল দেওয়া হয়। পুরোহিত মহাশয়ের কথায় মাকে অন্নভোগ না দিতে পেরে ধূপ আরাধনা করেই প্রথম থেকে এই মন্দিরে পুজোর শুরু তবে মা দুর্গা তাঁর অন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ খেতে যান বলে বিশ্বাস তাই অন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ আরতির পর এখানে মধ্যাহ্ন আরতি করা হয়। আরতির ক্ষেত্রে এখানে ধুনুচি ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ এবং চামর ব্যবহার করা হয়। এই ভাবেই মা এখানে ধূপ সেবা

নিয়ে আসছেন। মনে হয় গন্ধ-বণিকের প্রতিষ্ঠিত মন্দির তাই এই ধূপ-ধুনোর আরাধনাই মায়ের কাছে সংকল্প নেওয়া হয়েছিল যাতে মায়ের সেবার সাথে সাথে মায়ের কৃপাতে বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধিও হয়। তবে যে কারণেই হোক না কেন ধূপ আরতি আর ভোগ আরতি দুটোই যে আমাদের আরাধনা পদ্ধতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে তা বলতেই হয়। ধূপ আরাধনা অনেক প্রাচীন এটি যেমন সত্যি তেমনি প্রতিবার ধূপ আরতির সাথে ভোগ নিবেদন করে সাধারণের ক্ষুধা নিবারণের যে ভাবনা তাও সত্যি আমাদের সংস্কৃতির দূরদর্শিতার দিকটিই তুলে ধরে। যদি এখানে এক কথায় বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে ধূপ হল আমাদের মনের ক্ষুধা অর্থাৎ দেবতাকে মানসিক ভাবে অনুভব করতে সহায়তা করে তাই ধূপাগ্নি বৈরাগ্যের প্রতীক, অপরদিকে ভোগ আমাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ করে শরীরকে সতেজ রাখে। শরীর সতেজ না হলে মনকে কোনো কিছুতেই স্থির ও একাগ্র করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। এক্ষেত্রে তাই ভোগারতি এবং ধূপারতি দুটিই সম গুরুত্বপূর্ণ।

সুগন্ধি চিকিৎসা এবং ধূপের ব্যবহার

সুগন্ধ চিকিৎসা যা আমরা চলতি কথায় অ্যারোমা থেরাপি বলে থাকি তা আসলে কিন্তু অনেক প্রাচীন। এই থেরাপি বা চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে ধূপের ব্যবহার যেমন রয়েছে আবার ধূপ নির্যাস থেকে তৈরি তেলের ব্যবহারও করা হয়ে থাকে। দ্রাবিড় প্রদেশের নিবাসীদের অনেকের দাবি যে এটি ভারতীয় দ্রাবিড় সংস্কৃতির দান। তবে অনেকের মতে এই চিকিৎসা বা মন ভালো করার পদ্ধতি দ্রাবিড় সংস্কৃতির থেকেও আরো প্রাচীন যা কিনা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর হাত ধরে এসেছে এবং বর্তমান পূর্বভারতেই এর ব্যবহার বেশি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদে এই পদ্ধতির বিস্তার লাভ করা হয়। আসলে তখনকার দিনেও মন খারাপ বা একাগ্রতার অভাব হতো, আমরা এখন ভাবি যে তখন মন একাগ্র করা অনেক সহজ ছিল কিন্তু তার মানে এই নয় যে তখন একাগ্রতার অভাব বা মন খারাপ মানুষের হতোই না। মন থাকলে তা ভালো খারাপ হবেই এটাই তো স্বাভাবিক তাই সেই সময়কাল থেকেই কিছু পদ্ধতি ছিল যা মনকে ভালো রাখতে সহায়তা করত।

যদি আমরা অ্যারোমা থেরাপির বর্তমান স্তরগুলি দেখি তাহলে দেখব যে প্রথম স্তরে যা করা হয় তা হল আশপাশের হাওয়াকে সুগন্ধি করে তোলা এবং জীবাণুমুক্ত করা। প্রাথমিক এই স্তরের পরেই হল সুগন্ধি তেল বা এসেন্স সহকারে মালিশ, স্নান এবং অন্যান্য কিছু পছন্দ মতো পদ্ধতি। আমরা আজকাল অনেক দাম দিয়ে কিন্তু এই থেরাপিগুলো নিয়ে থাকি কিন্তু এই পদ্ধতিগুলি ঘরেও যে সহজেই করা যেতে পারে সে বিষয়ে কমই ভেবে থাকি। আমাদের ঠাকুমাদের সময়কালে দেখেছি তাঁরা রোজ ধুনো দেওয়াকে একপ্রকার এই ভাবেই বলতেন যে সকাল সন্ধ্যায় ধুনো দিলে গৃহদেবতা গৃহে সর্বদা বাস করেন এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে মন বসে। কথাটা যে তাঁরা না জেনেই বলতেন বা শুনে শুনে মনে মনে বিশ্বাস করতেন এটা স্বাভাবিক কিন্তু এই মৌখিক প্রচলিত বিশ্বাসগুলি যে বহু প্রাচীন কাল ধরে এক গভীর অর্থ বহন করে চলে আসছে তা আজও এই অভ্যাসগুলো দেখলে সহজেই বোঝা যায়। অনেক ছাত্রাবাসেও কিন্তু এই সুগন্ধির মাধ্যমে মনকে একাগ্র রাখার জন্য এই সুগন্ধ ধূপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেনারসের এক সংস্কৃত শিক্ষণ কেন্দ্রে ধুনুচি ধূপ দিয়ে ভালো করে ধূপিত করা হয় অধ্যয়ন শুরু করানোর আগে। আসলে এই পদ্ধতিগুলি আয়ুর্বেদ

এবং অনেক প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হলেও এগুলি কিন্তু মূলত সজীব রয়েছে সাধারণ গৃহস্থের অভ্যাসের মধ্যেই। তবে এখানে বলে রাখি ধূপকাঠির ধোঁয়া কিন্তু এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো দিক থেকেই উপযুক্ত নয় বরং তা অনেক বেশি রকমের ক্ষতিকারী।

ধুনো বা গুগগুল হল বৃক্ষজাত গোঁদ যার ভিতরের প্রাকৃতিক নির্যাসের মাধ্যমে বাতাস সুগন্ধময় ও শুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই এই ধুনুচি ধূপই কিন্তু এই পদ্ধতির উপযুক্ত। বৈদিক সময়ে ঋষিরা গাছের সজীবতা এবং কীটাণুনাশের জন্য বড়ো বড়ো ধুনুচির মধ্যে ধূপ করতেন যাতে গাছগুলিও সতেজ থাকে। আমার মনে হয় যেহেতু গাছের প্রাণ আছে তাই মানুষের মতো গাছেরও কিন্তু পজিটিভ এবং নেগেটিভ অনুভূতি থাকাটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি তখন কতটা তলিয়ে ভাবা হত সে বিষয়ে বলা কঠিন তবে গাছের সজীবতার বিষয়টি যে তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা স্বাভাবিক, কারণ আমরা দেখি গাছ নদী সব কিছুকেই ধূপ দিয়ে কীটাণুনাশের এবং সুগন্ধের উপর অনেকটাই গুরুত্ব দেওয়া হত।

আয়ুর্বেদের সুগন্ধি চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে সুগন্ধিকরণের মাধ্যমে মানুষকে বিষাদ থেকে দূরে রাখার বেশ কিছু পদ্ধতির কথা আছে যার মধ্যে ধূপ পদ্ধতি হল প্রাথমিক পদ্ধতি। বিশ্বের প্রাচীন দুই সভ্যতা ভারতীয় বা সনাতন সভ্যতা এবং গ্রিক সভ্যতার মধ্যে এই সুগন্ধি প্রয়োগের বহুল ব্যবস্থা ছিল যা আজ ধারাবাহিক অভ্যাসের মধ্যে জীবিত রয়েছে। ভারতের ধূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন মস্তিষ্কের সতেজতার কথা বলা হয়েছে আবার বদ্ধ জায়গায় এই ধোঁয়ার ব্যবহারও কিন্তু সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলা হয়েছে অর্থাৎ জানলা দরজা বন্ধ করে এই ধূপের ধোঁয়া কিন্তু ব্যবহার করা সঠিক নয় কখনোই। অবসাদকে দূর করে কর্মোদ্যম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২০০৯ সালে হপকিন্স এবং হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়েছে কোনোরকম ডিপ্রেশন অতি চিন্তা (anxity) থেকে ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ সহজেই মনকে ভালো অনুভূতি এনে দিতে পারে। পারিবারিক এক চিকিৎসার কারণে এক মনোচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গেও এই বিষয়টি আলোচনার পর তিনি জানিয়েছিলেন যে, ধূপের ধর্মাচারের দিকটি বাদ দিয়েও সারাদিনের ক্লান্তি বা কোনো বিষাদের কারণে মনকে একাগ্র করতে না পারার মতো সমস্যার ক্ষেত্রে ধূপ-ধুনোর ব্যবহার খুবই কার্যকারী। তাই ধূপের ব্যবহার যে কেবল পুজোপচার বা রীতিনীতির মধ্যেই আবদ্ধ নয় তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। তবে আসলে যেহেতু ভারত ধর্মপ্রাণ সমাজ তাই ধর্ম বা উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গ হিসাবে সেই অভ্যাসগুলিকে পালন করা এখানে অনেক সহজ তাই হয়তো প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ধূপের আরতি বা ধূপ দেখানোর চলনকে নিয়ম আচারের মধ্যে রাখা হয়েছে।

অখণ্ড ধূপ

অখণ্ড ধূপ কথাটি হয়তো অনেকের কাছেই নতুন মনে হতে পারে কারণ বিষয়টি যেহেতু আমাদের কাছে খুব একটা প্রচলিত নয় তাই নামটিও অপরিচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অখণ্ড ধূপ এবং দীপ সম্পর্কে যাঁদের বাড়িতে এখনও বহু বছর ধরে অর্থাৎ প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বছর ধরে পুজো চলে আসছে তাঁরা খানিকটা জানতে পারেন। আসলে অখণ্ড দীপ বা ধূপ হল কোনো সংকল্প নিয়ে দীপ বা ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন করা এবং পূর্ণাহুতির সঙ্গেই তা সমর্পণ ও শান্ত হবে। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলি, মহাষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধনের সময় যে দীপ প্রজ্জ্বলন করা হবে বা হোমাগ্নি বা ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হবে তা মহানবমীর হোম অনুষ্ঠানের পরেই শান্ত করা হবে। এখানে শান্ত করার কথাই বলছি কারণ অখণ্ড কোনো সংকল্পের অগ্নি নিয়ম অনুযায়ী নেভানো যায় না নিজে নিজে শীতল হতে দিতে হয় বা শান্ত হতে দিতে হয়। যদিও অনেকেই দুধ গঙ্গা জল দিয়ে শান্ত করেন আজকাল। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন এই অখণ্ড দীপ বা ধূপ তো হিন্দি প্রদেশে জ্বালানো হয় এটা বাঙালি পুজোর অংশ হল কবে থেকে! তাঁদের এখানে একটু বলে রাখি যে অখণ্ড ধূপ বা দীপ নামটা আসলে দেবভাষা থেকে এসেছে আর আমরা বাঙালিরা চলিত ভাষায় এটিকে যাগ প্রদীপ বা যাগ ধূপ বলে থাকি। অনেক জায়গায় ধূপাগ্নি ও হোমাগ্নিও বলা হয় যা কিনা ধুনুচি বা হোমকুণ্ডে জ্বালানো থাকে। অনেক পরিবারেই এই ধূপাগ্নিকে যজ্ঞ ধূপ বলা হয়। আর কোনো পদ্ধতিই বিশেষ প্রদেশের কখনোই নয় তার ধরন আলাদা হয় মাত্র।

অখণ্ড দীপের ব্যবহার যদিও ভারতের অনেক অংশেই আছে কিন্তু অখণ্ড ধূপ এখনও পূর্বভারতের প্রদেশগুলিতেই বিশেষ ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, যদিও এগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসছে। বেনারসে এই অখণ্ড ধূপকে অখণ্ড ধুনিও বলা হয়ে থাকে। অনেকে যদিও ধুনিকে বৈদিক হোমের কপিপেস্ট মনে করেন তবে ধুনি কিন্তু আর্যপূর্ব সময় থেকেই জ্বালানো হয়ে আসছে। আর্যপূর্ব সভ্যতাতেই কিন্তু এই ধুনি পাত্রের কথা জানতে পারা যায় যা সময় পরিবর্তনের সাথে ধীরে ধীরে ধুনুচির নানা

আকারে চলে এসেছে। আসলে ব্যবহারের সুবিধার্থেই আমরা পরিবর্তন করে থাকি। যজ্ঞকুণ্ড থেকে হোমকুণ্ড এবং বর্তমানে তারও ছোটো কুণ্ড এগুলো সবই সময় পরিবর্তনের সঙ্গে ঐতিহ্যকে ধরে রাখার তাগিদে। কারণ বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী পাত্র ও নিয়ম সরল না হলে তা ধীরে ধীরে অভ্যাস থেকে বাদ পড়বে যা হয়তো কেবল আনুষ্ঠানিক ভাবেই টিকে থাকবে এবং হয়তো সেটিও লুপ্তের পথে এগিয়ে যাবে। যদি আমরা একদম ভারতের উত্তরের দিকে যাই তাহলে দেখব যে সেখানে অখণ্ড দীপ জ্বালানোর প্রচলন অনেক বেশি অখণ্ড ধূপের থেকে, কিন্তু যতই বারাণসী থেকে বাংলার দিকে এগোতে থাকে সেখানে কিন্তু এই অখণ্ড ধূপ বা ধুনীর প্রচলন আমরা দেখে থাকি। আসলে মনে হয় ধূপের ব্যবহার পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির সাথে যত বেশি জড়িত ও পরিচিত ভারতের অন্য প্রান্ত এই বিষয়টিকে ঠিক ততটা গুরুত্ব সহকারে দেখেনি। যেহেতু তথাকথিত ভারতের উত্তর অংশ বৈদিক সংস্কৃতির গড় ছিল এবং দক্ষিণ ছিল দ্রাবিড় সংস্কৃতির কেন্দ্র তাই পূর্বের সহজ সংস্কৃতিকে খানিকটা ব্রাত্য হিসাবেই রাখা হয়েছিল। বারাণসীতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব আসলেও এই প্রাচীন বিষয়গুলি কখনোই সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি। বেনারস, গোরক্ষপুর বা পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলায় তাই এখনও কিন্তু নবরাত্রি বা দুর্গাপুজোতে এই জাগরণ ধুনি বা যাগ ধূপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। আসলে এটি অগ্নিরূপে দেবীর উপস্থিতির সাক্ষী স্বরূপ। পূর্ব ভারতে এই প্রথা বোধহয় অতি প্রাচীন এবং খানিকটা লৌকিক বিশ্বাস এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তন্ত্রের সাথেই এটির বেশি মিল পাওয়া যাবে। তন্ত্র অর্থে প্রাচীন ক্রিয়া এবং পরে মূলত শাক্ত সাধকরা তন্ত্রের বিকাশ নানা রকম ভাবে করেছেন। আমরা তন্ত্র বলতে শাক্ত ধারাকেই বুঝি যদিও বৈষ্ণব তন্ত্র সাধনাও কিন্তু করা হয়ে থাকে। যাই হোক যদি শাক্ত তন্ত্র ভাবনাই মেনে চলি তাহলে দেবীকে অগ্নি স্বরূপা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাতির অগ্নিকে নয় কোনো প্রাকৃতিক কাঠ বা দাহ্য বস্তুর মধ্যে যে সুপ্ত অগ্নি রয়েছে তাকেই বলা হচ্ছে। বাতির অগ্নি এক্ষেত্রে আলোকিত করার জন্য আহুতির জন্য নয়।

অখণ্ড ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রে তা বড়ো পিতলের ধুনুচিতেই জ্বালানো যেতে পারে বা মাটির ধুনুচিতেও জ্বালানো হয়ে থাকে। ধুনুচি ঠিক যে প্রকারে জ্বালানো হয় এটিও ঠিক সেইভাবেই জ্বালানো হয়ে থাকে তবে এই অখণ্ড ধূপ কিন্তু জ্বালাতে হবে ঘৃত বাতি বা ভালো করে বললে ঘিতে চোবানো ফুল বাতি দিয়ে। ফুল বাতি হল পঞ্চপ্রদীপের শিখা জ্বালানোর জন্য যে বাতির ব্যবহার করা হয় তাই। অখণ্ড ধূপ কর্পূর দিয়ে জ্বালানো কিন্তু সঠিক বিধি নয়। মনে হয় কর্পূর অনেক তাড়াতাড়ি ছোবড়াগুলি জ্বালিয়ে অনেকটা ধোঁয়া দিয়ে থাকে তাই এটি তাড়াতাড়ি ধূপ করার ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগশীল কিন্তু অখণ্ড ধূপ যেহেতু ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকবে তাই

এই বাতি দিয়ে জ্বালানোর বিধি। তবে অখণ্ড ধূপ কিন্তু সারাদিন জ্বালিয়ে রাখতে হলে তা কেবল নারকেলের ছোবড়ার সাহায্যে জ্বলবে না। বহিরের প্রদেশে ঘুঁটে দিয়ে এটি জ্বালানো হয় তাই ধীরে ধীরে অনেক্ষণ থাকে তবে যারা ঘুঁটে দিয়ে না জ্বালায় বা জ্বালালেও তার মধ্যে দেবদারুর ছোটো এক ধরনের কুচি কাঠ পাওয়া যায় যা ঘি দিয়ে মাখিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এর ফলে সেটি ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে নেভেই না কখনও। দেবদারুর কাঠের কুচিতে নিজস্ব তৈল থাকে যা ধূপাগ্নিকে জ্বালিয়ে রাখে এবং সাথে ঘি ব্যবহার করা হয় বলে তা সহজেই প্রজ্জ্বলিত থাকে। তবে এটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য ধুনুচির আকারটিও খানিকটা বড়ো হওয়া প্রয়োজন হয়। অখণ্ড ধূপ কিন্তু আসলে যজ্ঞ ধূপ এবং সংকল্পের প্রতীক। এই ধূপ কিন্তু ষোড়শের পুজোতে নিবেদন বা আরতি করা যাবে না। যদিও অনেক বাড়িতে দুটি অখণ্ড ধূপ জ্বালানো থাকে তাই একটি দিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে কিন্তু সেটি কুলাচার মাত্র।

এই অখণ্ড ধূপ জ্বালানোর বিধি অনেক জায়গায় পারিবারিক ভাবে আলাদা আবার প্রদেশগত ভাবেও, যেমন আগেই বলেছি যে অনেক জায়গাতেই ঘুঁটে দিয়ে এই ধূপাগ্নি প্রজ্জ্বলন করা হয়ে থাকে। তবে সংকল্পের উপর এই ধূপ জ্বালানো নির্ভর করে। অখণ্ড দীপ যেমন নেভানো হয় না কিন্তু অখণ্ড ধূপের ক্ষেত্রে তা প্রতিদিনের সংকল্পও হয়ে থাকে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের মঙ্গল আরতির সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায় আরতি পর্যন্ত এই ধূপাগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয়। সেক্ষেত্রে ধূপপাত্রটি পরের দিন ভালো করে মেজে ধুয়ে আবার জ্বালানো যেতেই পারে। আবার অনেক জায়গাতেই এটি পুরোপুরি সংকল্প নেওয়া হয় অর্থাৎ যদি কৃষ্ণা নবমী থেকে দুর্গাপুজা শুরু হয় তবে সেদিন থেকেই এই অখণ্ড ধূপ বা ধুনি জ্বালানো থাকে নবমীর হোম পর্যন্ত আবার অনেকের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত। তবে এক্ষেত্রে একভাবে অনেক সময় ধুনুচিটি জ্বালিয়ে রাখা মুশকিল হয় এবং তা কালো হয়ে যায় তাই অখণ্ড ধূপের ধূপাগ্নি থেকে একটি ছোটো ধুনুচি জ্বালিয়ে নিয়ে আবার সেটি মেজে ধুয়ে ওই ছোটো ধুনুচির ধূপাগ্নি দিয়ে সেটি জ্বালানো হয় যাতে অখণ্ড সংকল্পটিও থাকে এবং ধূপপাত্রটিও কালো দেখায় না। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অখণ্ড ধুনুচিটি নাড়ানো হয় না।

এখানে একটি বিষয় একটু জোর দিয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যেটা হল বাংলায়, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বেনারস পর্যন্ত দুর্গাপুজোতে ধূপাগ্নি বা ধুনি অথবা হোমাগ্নি অখণ্ড প্রজ্জ্বলন করে রাখার প্রচলন অনেক বেশি। যদি হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থানের দিকে আমরা যাই তাহলে কিন্তু আবার অখণ্ড দীপ জ্বালানোর প্রচলন অনেক বেশি পেয়ে থাকব। আসলে পূর্ব ভারতে এই ধূপ বা ধুনি জ্বালানোর ব্যবহার মনে হয় এতটাই প্রাচীন যে তথাকথিত বৈদিক বা পৌরাণিক ধারা এটিকে পুরোপুরি বদলাতে পারেনি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে এই ধূপ জ্বালানোকে তাই এক

একটি বিশেষ যজ্ঞ ক্রিয়ার সমান বলা হচ্ছে। বৈদিক ভাবে হোম ক্রিয়ার আগে থেকেই এই ধুনি বা ধুনো পুজোর প্রচলন মাতৃ আরাধনায় ছিল।

মানুষ সভ্য ভাবে বসবাসের আগে থেকেই এই ধুনি করত বলে সাধারণ ধারণায় মনে করা হয়। বনের কাঠ, পাতা, ছাল, বাকল দিয়ে এই ধুনি জ্বালানো হত তবে কোনো বেদি বা পাত্রের প্রচলন তখনও হয়নি। আসলে মানুষ তখন যাযাবর হিসাবে ছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ যখন স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন তখন তার গৃহস্থ ধর্মের মতো করে অনেক জিনিসের ব্যবহার শুরু হতে থাকে; এই ধুনি জ্বালানোর জন্য তখন পাত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সামর্থ্যবান ব্যবসায়ীরা ধাতুর ধুনি পাত্র ব্যবহার করত আর সাধারণ মানুষেরা মাটির। কারণ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচার-পদ্ধতিরই পরিবর্তন হয়। বর্তমান ধূপপাত্র অর্থাৎ ধুনুচি কিন্তু সেই প্রাচীন সভ্যতার ধুনি পাত্রের সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে এক প্রকার। আমরা এখনও হয়তো গঙ্গাসাগর বা কুম্ভমেলাতে কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে ধুনির সামনে সাধু সন্তদের বসে থাকতে দেখব আবার কিছু আখড়ায় অখণ্ড ধুনি ধূপ জ্বালিয়ে রেখে আরতি ভজন করতে দেখব। আসলে আমরা ভাবি বৈদিক পদ্ধতিতেই আমাদের পুজো অর্চনা হয়ে থাকে এবং সেটাই সঠিক কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের নিরাকার ও সাকার দুই আরাধনা পদ্ধতির প্রাচীন রূপ ছিল সর্ব সাধারণের জন্য তাই এই সহজ ভাবে শুধু ধূপের ধুনি দিয়ে আরতি করে পুজোর চলন এখনও সর্বাধিক জনপ্রিয়, না শুধু গৃহস্থদের মধ্যে এমনকি কোনো মঠ আশ্রমের সন্ন্যাসী উপাসকদের মধ্যেও।

বারাণসীর এক পরিবারে অখণ্ড ধূপ জ্বালানোর বিবরণ দিয়েই এই বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা শেষ করব। বারাণসীতে এক প্রকার অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। আসলে ওখানে হলুদের মধ্যেই এই চালগুলি রাখা হয় যার ফলে এই ধরনের রং। বাংলার বহু বিয়ের নিয়মেও এই হলুদ কোটা চালের ব্যবহার করা হয়। এই চালের মাধ্যমে অষ্টদল পদ্ম বানানো হয় দেবতা ও ঘটের বামদিকে। এবার একটি ঘিয়ের বাতি প্রথমে জ্বালানো হয় তারপর তার মধ্যে ঘুঁটে অথবা নারকেলের ছোবড়া (স্থানীয় ভাষায় নারকেলের জটা) দিয়ে সাজানো হয় এবার উপরে ধূপ সামগ্রী দিয়ে ঘি দিয়ে তার উপর দেবদারুর কাঠ দেওয়া হয় ও তার উপর আবার ধুনো-গুগগুল দেওয়া হয়। এই ভাবেই ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে। মাঝে মাঝে এই কাঠ ও ধূপ মিশ্রণ এই ধূপপাত্রের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তাতে এটি প্রজ্জ্বলিত থাকে। এটির ধোঁয়া একটু আস্তে আস্তে ওঠে। সাধারণত পিতলের ধুনুচিতেই এটি করা হয়ে থাকে। তবে অনেকে মাটির পাত্রেও করেন। এখানে বাঙালির দুর্গাপুজোর অখণ্ড ধূপ সম্পর্কে একটু বিবরণ দিই তাহলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। বাঁকুড়ার এক পরিবারে পঞ্চমীর দিন বোধন বসে এই ধূপাগ্নি

জ্বালিয়ে আরতি করে এরপর সেটি সন্ধিপুজোর ধুনো পোড়ানোর পরেই শান্ত করা হয় তার আগে পর্যন্ত সেটি প্রজ্জ্বলিত থাকে। বাংলায় তন্ত্র মতে পুজোর ক্ষেত্রে অখণ্ড ধুনি জ্বালিয়ে রাখার অর্থ হল মাতৃশক্তি জাগিয়ে রাখা। শাক্ত ধারার বেশ কিছু মতে সংকল্পের প্রতিদিনের সাক্ষী হিসাবেও এই অখণ্ড ধূপ প্রজ্জ্বলিত থাকে। যেমন যদি কেউ মহাষ্টমীর পুজো শুরু করার আগে মঙ্গল আরতির সময় এই অখণ্ড ধূপ জ্বালায় তবে তা সাক্ষী হিসাবে রাখা হয় মায়ের সন্ধ্যা আরাত্রিক পর্যন্ত। দক্ষিণের শ্রী সম্প্রদায়ের মতে ধূপের অগ্নি হল কুমারী অগ্নি তেজস্বরূপ।

বারাণসীর কিছু স্থানীয় পারিবারিক এবং বাংলার কিছু অতি প্রাচীন পুজো ছাড়া এই অখণ্ড ধূপ প্রজ্জ্বলনের চলন প্রায় এখন আর নেই বললেই চলে। আসলে কালের স্রোত অনেক কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বারাণসীর কিছু আশ্রমে যদিও এখনও অখণ্ড ধুনি জ্বালানোর চলন রয়েছে। আর এখনকার ব্যস্ত সময়ে এই ধরনের সংকল্পও কেউ নিতে আগ্রহী নয় কারণ তাতে অন্যরকম আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে। পুজো এবং বাৎসরিক অনুষ্ঠানে এই ধরনের সংকল্প নিলে তার জন্য একনিষ্ঠ ভাবে শুদ্ধাচারে পালন করতে হয়, আসলে অখণ্ড ধূপ বা দীপ জ্বালানোর যে অনেক অসুবিধা সেটার থেকেও বড়ো কথা হল এই ধরনের বিষয় পালন করার অনিচ্ছাই মানুষের মধ্যে বেশি। কারণ অখণ্ড যাগ ধূপ বা দীপ নেভানো যাবে না তাহলে তা অমঙ্গলের কারণ হতে পারে এই বিশ্বাস যেহেতু মানুষের মনে বদ্ধমূল তাই এই দায়িত্ব থেকে সবাই পিছপাই থেকে যায়। তাই এখন এর বিকল্প ব্যবস্থা করেই পুজো সম্পন্ন হয়। তবে বারাণসীর এক সন্ন্যাসীর কথায় অখণ্ড ধূপ বা ধুনি অন্নপূর্ণা মহামাইয়ের নামে প্রজ্জ্বলন করলে তা জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব মা নিজেই নিয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে ভক্তি বিশ্বাসই প্রধান যার অভাবটাই বর্তমানে বেশি।

ধূপ নৈবেদ্য ও পঞ্চবায়ু

নৈবেদ্য এই কথাটা শুনলেই আমাদের মনে কিন্তু প্রথম যে বিষয়টি আসে তা হল কোনো না কোনো ভোজ্য বস্তু যা আমরা সাধারণত দেব সেবায় নিবেদন করে থাকি, কিন্তু নৈবেদ্য কেবলমাত্র এই ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নৈবেদ্য অর্থে নিবেদন করাকে বোঝানো হয় তা সে মানস উপচারে হোক বা বাহ্য উপচারেই। আসলে দেবতাকে যা কিছু নিবেদন করা হয় 'নমঃ' বা 'নিবেদয়ামি' বলে তা সব কিছুই নৈবেদ্য। এর মধ্যে স্থূল অর্থে ও সূক্ষ্ম অর্থে নৈবেদ্যর ভাবনা রয়েছে যেমন প্রত্যক্ষ নিবেদন ও পরোক্ষ নিবেদনের ভাবনা। প্রত্যক্ষ নিবেদিত যা দেবতারা পূর্ণ গ্রহণ করেন আর পরোক্ষ নিবেদন হল তাই যা, দেবতারা আঘ্রাণ মাত্র গ্রহণ করে তা সাধারণ ভক্তদেরকে কৃপা হিসাবে প্রদান করেন। এর মধ্যে বৈদিক, তান্ত্রিক ও ভাগবত পৌরাণিক ভাবনা আলাদা আলাদা ভাবে বিধির প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বামী সারদানন্দ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী তন্ত্রোক্ত পুজো নৈবেদ্য ও পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবনার পুজো নৈবেদ্য নিয়ে তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন "তান্ত্রিক দেবতাকূল নিবেদিত ফলমূল আহার্যাদি দৃষ্টিমাত্রেই সাধকের নিমিত্ত পূত করিয়া দেন এবং উহা গ্রহণে সাধকের কামক্রোধাদি পশুভাবের বৃদ্ধি না হইয়া আধ্যাত্মিক ভাবই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। বৈষ্ণবাচার্যগণের নব-প্রবর্তিত প্রণালীতে দেবতাগণ ওই সকল আহার্যের সূক্ষ্মাংশ এবং সাধকের ভক্তির আতিশয্যে ও আগ্রহনির্বন্ধে কখনো-কখনো স্থূলাংশও গ্রহণ করিয়া থাকেন—এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত হইল।"। আসলে যদি পৌরাণিক ভাবনাকে বাদ দিয়ে আদি বৈদিক বা প্রাচীন তন্ত্রের ভাবনাকে মূল হিসাবে দেখি তাহলে দেখব দেবতারা আহুতি ও ধূপ-আদি সামগ্রীর মাধ্যমেই সূক্ষ্ম ভাবে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন ও তার তাপ ও ধূম্রের মাধ্যমে সাধারণ ভক্তদের প্রসাদ দিয়ে থাকেন। বেদ ও তন্ত্রের অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবনার এখানেই মূল কিন্তু পুরাণ বা আরো ভালো ভাবে বললে উপপুরাণগুলিতে এই প্রাচীন ভাবনার জায়গায় দ্বৈত ভাবটাই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায় সেই ভাবেই তাঁদের প্রিয় খাদ্য ও ভোজ্য আদি। তাই নৈবেদ্যর আদি ভাবনা কিন্তু সেই বনস্পতি সামগ্রী ও অগ্নি আহুতির মধ্যেই, তা সে অগ্নিহোত্রই হোক অথবা ধূপ-ধুনো।

আমাদের অনেকেরই পুজোর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মনে হয় যে যদি কেবল দেবতাকে খাদ্যবস্তুই নিবেদন মূল হয় তাহলে এই ধূপধুনো বা প্রদীপ আদির প্রয়োজন কোথায়? আসলে যদি আমরা সাধারণ পঞ্চোপচার পুজোর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব প্রথমে গন্ধ পুষ্প অক্ষত দিয়ে পুজো করে ধূপ নিবেদন ও তারপর দীপ নিবেদন ও তারপর ভোগ্য হিসাবে নৈবেদ্য নিবেদন। আর একটু বিস্তারিত দশোপচারে দেখব এর মধ্যে আচমনীয় ও পুনরাচমনীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা। আসলে ধূপ দীপ সব কিছুর পরেই নিজে হাত ধুয়ে নেওয়া (হস্ত প্রক্ষালন) ও দেবতাকে আচমনীয় জল প্রদান করার নিয়ম কারণ প্রতিটি বস্তুই নৈবেদ্য। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় পুজো পদ্ধতির মধ্যে তাই 'ধূপ নৈবেদ্যম' 'দীপ অর্চনম' এই ভাবেও নিবেদন করা হয়। আসলে প্রতিটি উপচারেরই অধিপতি আলাদা আলাদা যেমন ধূপের বনস্পতি, দীপের অগ্নি, অন্যান্য উপচারের অন্যান্য দেবতা কিন্তু যেহেতু শ্রীবিষ্ণু সকল অধিপতির অধিপতি তাই বলা হয় অধিপতয়ে দেবার শ্রী বিষ্ণবে। প্রত্যেকটি উপচারই স্বতন্ত্র এবং সবগুলিই নৈবেদ্য। তাই যে কোনো এক পুজো উপচারেও অর্চন করা যায় যেমন গন্ধ অর্চন, পুষ্প অর্চন, ধূপ অর্চন, দীপ অর্চন, ভোগ-ভোজ্য অর্চন ইত্যাদি। ধূপ ও দীপ জ্যোতিস্বরূপ ও এককথায় বললে বলতে হয় আদি নৈবেদ্য যা পৌরাণিক পুজোর স্থূল ভোগ আদির প্রভাব অতিমাত্রায় হলেও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাই কিন্তু পাঁচ হোক সাত হোক ষোড়শ হোক অষ্টাদশ হোক তাতে ধূপ দীপ ও তার পরেই ভোগ নৈবেদ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে এক তন্ত্র বিশযজ্ঞের কথায় আগমে প্রতিটি উপচারের শেষে নৈবেদ্য কথাটি আসছে যেমন—গন্ধং পুষ্পং চ ধূপং চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।

অর্থাৎ নৈবেদ্য কোনো ভোজ্য এখানে নয় এখানে সব বস্তুগুলি নিবেদনের অর্থে নৈবেদ্য শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে। ভোগ বা ভোজ্য হল প্রিয় নিবেদন মাত্র অর্থাৎ দেবতাকে আপনার মনে করে খাদ্য আদি দেওয়া। স্থূল খাদ্য দেবতার খাদ্য কখনোই নয় কারণ 'দেবতনু অগ্নিজ্যোতি' স্বরূপ। এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী খুবই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে ও দেবতাদের জ্যোতিঃস্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন "অগ্নিমুখেই যে দেবতারা খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। দেবতারা সূক্ষ্ম শরীরী, তাঁহারা স্থূল অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কোনো দ্রব্য আগুনে ফেলিলে তাহা ধূমে, বাষ্পে, বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপ সূক্ষ্মতা পাইলে উহা দেবতাদের সূক্ষ্মদেহের উপযোগী হয়।"। প্রাচীন আরাধনার ধুনুচি ধূপ ও বৈদিক সংস্কৃতিতে অগ্নিহোত্র এই প্রত্যক্ষ নৈবেদ্য নিবেদনের সার বস্তুকেই তুলে ধরে।

অগ্নিহোত্র হল গৃহস্থের নিত্য কর্ম। যজুর্বেদ-এর মধ্যেই এই নিত্য অগ্নিক্রিয়ার কর্মকাণ্ড বর্ণিত যা সকলের জন্যই। যজুর্বেদ হল 'যজুস' শব্দ থেকে, তার অর্থ হল দেবতাদের আহুতি। নিত্য ধূপ ধুনুচির প্রাচীন পরম্পরাও কিন্তু সেই অর্থে গাছের ছাল

বাকল ও ছোবড়ায় অগ্নি প্রজ্বলন করে তাতে ধূপ গুগ্‌গুল আদি ভেষজ ঔষধি চূর্ণ যা তথাকথিত ভাষায় ধূপ তাই দেবতাকে দেবার প্রচলন। হরিভক্তিবিলাস ও শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীজাতীয় স্মার্ত ও আগমোক্ত পূজা বিধানের গ্রন্থগুলিতেও কিন্তু নিত্য ছয় প্রকারের ধূপ (ষড়ঙ্গ ধূপ) ঘৃত সহকারে করার কথা বলা হয়েছে। হিন্দি ভাষায় ধূপ শব্দে সূর্য তাপ ও সুগন্ধি দুটিকেই বোঝানো হয়। এই সূর্যের সঙ্গে অগ্নি ও বায়ুর সঙ্গে সুগন্ধি ধোঁয়ার সম্পর্কের প্রাচীন ভাবনা যে ধূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে নিহিত ছিল এটা অনেকটা অনুভব করা যায়। যজ্ঞীয় প্রক্রিয়াতে অগ্নিহোত্র নিত্য করার ফলে অগ্নি তাঁর পবিত্র দাহিকা শক্তি দিয়ে হব্য নৈবেদ্যকে দেবভোগ্য ধূম্র সমান করে পঞ্চবায়ু মাধ্যমে প্রেরণ করেন এবং দেবতারা প্রীত হয়ে গ্রহণ করে তা অপ্ প্রসাদ রূপে পৃথিবীতে বর্ষা রূপে প্রেরণ করেন যা প্রাণের উৎস জল হয়ে ধরিত্রীতে জীবনদায়িনী হয়ে ওঠে। অপ্ হল স্থূল অর্থে জল কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থে প্রাণ। সূক্ষ্ম প্রাণবায়ুর মাধ্যমেই দেবতারা নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ধূপের প্রাচীন ও আদি ভাবনার মধ্যেও এই দর্শনই নিহিত।

যজুর্বেদের মন্ত্র পুষ্পমে বলা হয়েছে—

"অগ্নির্বা আপাময়তানাং, আয়াতনবান ভবতি।
যো আগ্নেয়েরআয়াতানাম বেদা, আয়াতনবান ভবতি।
আপবা আগ্নেয়আয়াতানাম, আয়াতনবান ভবতি।
যা এবম বেদা, যপ মায়াতানাম বেদা আয়াতনবান ভবতি।"
"বার্য়ূরবা আপাময়তানাং, আয়াতনবান ভবতি।
যব ওরাআয়াতানাম বেদা, আয়াতনবান ভবতি।
আপভেদে ভায়োর্যাতনাম, আয়াতনবান ভবতি।
যা এবম বেদা, যপমায়াতানাম বেদা আয়াতনবান ভবতি।"

এর সারাংশ হল, অগ্নি হল জলের উৎস আর জল হল প্রাণের বীজ। অগ্নির মতো বায়ুও হল জলের উৎস আর জল হল প্রাণের বীজ। এই পরম সত্য যিনি উপলব্ধি করে নেন তিনি বেদকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। আসলে বেদের অর্থ হল জ্ঞান, আর পরমাত্মা আর জীবাত্মার মধ্যেকার মানসিক সূক্ষ্ম আদানপ্রদানই হল পরম জ্ঞান।

আগম অনুসারে নৈবেদ্যের পুরো বিধির ক্ষেত্রে তাই প্রথমে বায়ু বীজের মাধ্যমে দোষ সংশোধন তারপর অগ্নি বীজের দ্বারা দোষ দাহ ও তারপর বরুণ বীজের মাধ্যমে প্রোক্ষণ করে তা যথাবিহিত নৈবেদ্য মন্ত্রে নিবেদন করে গ্রাস ও প্রাণবায়ু মুদ্রা প্রদর্শন করা হবে। অর্থাৎ সেই বায়ু ও অগ্নি মাধ্যমকেই কিন্তু এখানে অন্যভাবে প্রাধান্য

দেওয়া হচ্ছে তন্ত্রোক্ত ভাবনায়। বায়ু ও অগ্নি মাধ্যমে কোনো কিছু সংশোধিত হয়েই যে তা দেবতাদের ভোগ্য নৈবেদ্য হয়ে ওঠে তারই প্রকাশ এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই।

দেব-নৈবেদ্য পঞ্চবায়ুর মধ্যে দিয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন, এই পাঁচ বায়ু হল প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে "প্রাণপান-সমানাশ্চদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ। সমানঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ঃ প্রাণাঃ পঞ্চ সমীরিতাঃ।।" অর্থাৎ, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পাঁচটি প্রাণবায়ু ও সমান সর্বদা পঞ্চম বায়ু। এই প্রাণবায়ুর কথা মানস উপচারে পুজোর ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে প্রাণবায়ুস্বরূপ ধূপ নিবেদন ও তেজরূপ দীপ এবং অমৃতরূপ নৈবেদ্য। প্রতিটি নৈবেদ্য নিবেদনের পরে গ্রাস মুদ্রা সহ এই প্রাণমুদ্রা বা পঞ্চপ্রাণমুদ্রা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। নিবেদিত নৈবেদ্য দেবতারা গ্রহণ করেছেন এই সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু মাধ্যেমে এই ভাবনার মাধ্যমেই এই মুদ্রা দেখানো হয় এর পরেই পুনরাচমনীয় প্রদান আদি। আসলে বঙ্গদেশে আমরা এই মুদ্রা প্রদর্শন কেবল ভোগ নৈবেদ্যের ক্ষেত্রেই দেখে থাকি কিন্তু যদি দ্রাবিড় প্রদেশে কিছু প্রাচীন পদ্ধতির পুজো দেখি তাহলে দেখতে পাব 'ধূপ অনুবাসন' মাধ্যমে ধূপ আঘ্রায়ণ ও 'ধূপম নৈবেদ্যম' নিবেদন করেও এই মুদ্রা প্রদর্শিত ও আচমনীয় প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অগ্নি মাধ্যমে পঞ্চপ্রাণবায়ু মাধ্যমে নৈবেদ্য গ্রহণের মূল ভাবনাটিই নিহিত।

দেবতাকে ধূপ নিবেদনের মন্ত্রে বলাই হয়েছে "গন্ধর্বা সুরভোজনঃ" অর্থাৎ যে ধূপ গন্ধ দেবতাদের ভোজনস্বরূপ। ধূপ সেবা করার পদ্ধতির ক্ষেত্রেই এই নৈবেদ্য ধূপ অর্পণ করে দেবতাদের গন্ধ ভোগ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে নীরবতা পালন অর্থাৎ কোনো শব্দ মুখে না করে মনে মনে মন্ত্র পাঠ করে ধূপ নৈবেদ্য অর্পণ। কিছু নিয়ম অনুসারে এই সময় শ্বাসকেও কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে ধূপ অর্পণ করা উচিত কারণ ধূপ যেহেতু গন্ধ ভোগ তাই সেটিকে আগে নিজে ঘ্রান না নিয়ে দেবতাদের আঘ্রায়িত করা। এই নিয়ম যদিও ধূপ সেবায় ধূপ নৈবেদ্য নিবেদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'লক্ষ্মী তন্ত্রে' অষ্টাদশ উপচার নিবেদনের ক্ষেত্রে ধূপ নিবেদনের দুরকম বিধির উল্লেখ পাওয়া গিয়ে থাকে। এক হল ষড়ঙ্গ ধূপ হিসাবে ধূপ নিবেদন এবং আরেকটি হল 'অনুবাসন' অর্থাৎ সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে ধূপবাসিত বা সুগন্ধি প্রদান। এক্ষেত্রে ধূপের সামগ্রী যে নৈবেদ্য রূপ ও ধূপের সুগন্ধ যে গন্ধ রূপ ভিন্ন ভিন্ন দুটি উপচার তা সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

যদি ধূপের সেবার মাধ্যমে আরাধ্যের দিন চর্চার কথা শুরু করি তাহলে প্রথমেই মঙ্গলধূপের কথা আসে সঙ্গে দিনের প্রথম আরতির কথা। দিনের প্রথম সেবা তাই এই ক্ষেত্রে দেবতা বা দেবীর যে ধূপ দেওয়া হয় তার মধ্যে মূলত ধুনা, গুগ্‌গুল এবং কর্পূর বিশেষ ভাবে থাকবে। কপূর দিয়েই মঙ্গল ধূপ জ্বালানো সবচেয়ে সঠিক তবে ঘি বাতি দিয়েও জ্বালানো যেতে পারে কিন্তু কাগজ দিয়ে কখনোই জ্বালানো হবে না।

এবার সকল ধূপ বা পুজো-ধূপের ক্ষেত্রে প্রধানত নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে পঞ্চাঙ্গ ধূপ বা যড়ঙ্গ ধূপ। ঘি এবং শর্করা এই ধূপে বিশেষ ভাবে করা হবে ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে। এবার মধ্যাহ্ন-ধূপের ক্ষেত্রে প্রধানত সপ্ত ধূপ ব্যবহার করা হবে তবে কেবল ধূপের সেবার ক্ষেত্রে শুকনো নারকোল সহযোগে ঘি দিয়ে ধূপ করার চলনও দেখা যায় যা কিনা দেবতাদের ভোগ নিবেদনের সমান। সপ্ত ধূপের মধ্যে থাকে ধুনা, গুগ্‌গুল, অগরু, চন্দন, নখী, জায়ফল, ঘি। এবার উত্থান সময়ে দেবতাদের ধুনো, চন্দন ও গুগ্‌গুল সহযোগে ধূপ বিলাস করতে হবে। এরপর সন্ধ্যা-ধূপ এবং আরতির সময় তাই এই সময় ধূপ সামগ্রী হিসাবে দেওয়া হবে ধুনো, গুগ্‌গুল, অগরু, চন্দন ইত্যাদি। এই সুগন্ধি ধূপ সহযোগেই করা হবে ধূপ আরতি। কারণ সন্ধ্যা আরতি হল ধূপের সুগন্ধে দেবতার অর্চনা করা ও বিনোদন এক প্রকার। তাই বলা হয়ে "গন্ধাঢ্য সুমনোহরাঃ।" এই ভাবেই মূলত ধূপের ব্যবহার প্রতিদিন হয়ে থাকে যদিও অষ্টাঙ্গ ধূপ সমর্পন করেও মঙ্গল আরতি থেকে সন্ধ্যা আরতি পর্যন্ত ধূপ সেবা ও আরতি করা যেতে পারে। তবে কোনো কিছুর অভাবে কেবল ধুনো, গুগ্‌গুল, শ্বেত চন্দন বা নীত চন্দন সহযোগেই দেবতার ধূপ সেবা আরাধনা ও আরতি করা যেতে পারে। যে ভাবে দেবতার ভোগের সামগ্রী দিনের প্রতি প্রহরে বদলায় নিত্য সেবার ক্ষেত্রে, ধূপের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই নিয়ম রয়েছে যদিও তা পালন সাধারণ বাড়িতে খুবই কম হয়ে থাকে। বেনারসের ও প্রয়াগের কিছু মন্দির ও মঠেই এই নিয়ম এখনও দেখতে পাওয়া যায় তবে তার সংখ্যা হাতে গোনা। যাই হোক এই মঠগুলি যে ভোগ সেবার সাথে ধূপ সেবার এই বিধিগুলিকে এখনও বজায় রেখেছেন এটাই বড়ো কথা।

কোঙ্কণ প্রদেশে পঞ্চবায়ুর প্রতীক ধূপ আরতি করা হয়ে থাকে যা 'পঞ্চ ধূপ নীরাজন' বা 'পঞ্চ ধূপঃ নীরাজনম্' নামে পরিচিত। দক্ষিণেও এই আরতির চলন রয়েছে। পাঁচটি আলাদা আলাদা ধূপপাত্রে অর্থাৎ ধুনুচিতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ুর প্রতীক হিসাবে ধূপ নিবেদন করে আরতি করে সপ্ত দীপমালায় দীপ আরতি করে পঞ্চ ধূপ নীরাজন পূর্ণ করা হয়। এই বিধিটির মূল ভাবনা হল ধূপ মাধ্যমে আরাধ্যের উদ্দেশে পঞ্চ প্রাণে আরাত্রিক নৈবেদ্য নিবেদন।

ধূপ দেবতারা পঞ্চবায়ুর মাধ্যমেই গ্রহণ করেন যা মানস পুজোর উপচারের ক্ষেত্রে প্রাণবায়ু হয়ে যায় তাই পুজোর উপচার মন্ত্রে বলা হয়েছে "ধূপম প্রাণ প্রকল্পয়েৎ"। প্রাণ বায়ু রূপ সূক্ষ্মতার প্রতীক ধূপবায়ু। দেব নৈবেদ্য এই সূক্ষ্ম পঞ্চবায়ুর মাধ্যেমেই গ্রহণীয় হয়ে প্রসাদ রূপে আমরা পেয়ে থাকি। নৈবেদ্য ও প্রাণবায়ু বা বলা ভালো পঞ্চবায়ু একে অপরের সাথে এই ভাবেই সম্পর্কযুক্ত হয়ে আরাধনাকে সম্পূর্ণ করে তোলে।

সাকার ও নিরাকার ধূপ আরাধনা

সাকার বা নিরাকার আরাধনার যে প্রকার বৈসাদৃশ্য আছে বলে আমরা ভেবে থাকি তা কিন্তু সেই অর্থে একেবারেই নয় বরং বলা চলে এটি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এটি যতটা পদ্ধতিগত ভাবে আলাদা তার থেকে অনেক বেশি এটিকে মানসিক ভাবে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন এর পিছনে খানিকটা কারণ, আবার মানুষের লৌকিক বিশ্বাসও অনেকটা কারণ। আসলে যদি অদ্বৈতবাদ-কেই লোকে আশ্রয় করে তাহলে ভিন্ন ভিন্ন দেবপুজোয় ভাঁটা পড়বে এবং এই মানসিকতায় চললে স্মার্ত বিধান যে আর মানুষের প্রয়োজন হবে না সেই কারণেও নিরাকার উপাসনাকে গৃহস্থের সামনে সেইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি, সঙ্গে লৌকিক পুজো আচারবিধি এবং ব্রত এগুলি যেহেতু প্রাচীন সময় থেকেই চলে আসছে তাই সাধারণ মানুষও সহজে অদ্বৈতবাদকে আপনার করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। আসলে আমরা যতই বৈদিক বিধি বলি না কেন বেদের উচ্চ দর্শনের প্রভাব আমাদের নিত্য দিনের পদ্ধতির মধ্যে কতটা বোধগম্য এটা সত্যি প্রশ্নের বিষয়। পুরাণও যে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তাও মনে হয় না, কারণ পুরাণে কিন্তু দেবতাদের পুজোর বিষয়ে সহজ মতকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ আমাদের পুজো আচ্চার মধ্যে যা কিছু আমরা দেখে থাকি তা সত্যি বলতে নানা স্মার্ত বিধান, যার মধ্যে বৈদিক মন্ত্র এবং পুজো তন্ত্র যেমন আছে তেমন প্রাচীন লৌকিকতাকেও নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ক্রিয়ার মাধ্যমে। আসলে সাধারণ মানুষের লৌকিক পদ্ধতিগুলি যদি তাঁদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তা যে অনেকটাই শুষ্ক আচার পদ্ধতি হয়ে যাবে যে বিষয়টি বুঝে ছিলেন স্মার্ত বিধান কর্তারা। তাই তাঁরা বেদ, পুরাণকে যেমন যথা সম্ভব ব্যবহার করেছেন ঠিক তেমনি লৌকিক পুজো তন্ত্রকেও এক নতুন আঙ্গিকে ও বিকল্প ভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন হোম ক্রিয়ায় অপারগের ক্ষেত্রে ঘৃত-গুগগুল-ধুনো ধূপ আহুতি দিয়ে আরতি করলে তা

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমান ফল দেয়। যা কিনা বৈদিক অগ্নিহোত্রর দিকটিও থাকল আবার লৌকিক আরাধনা তন্ত্রের সহজ দিকটিও। আসলে বেদ নিজেই বলেছে যে তুমি তোমার আরাধনার মাধ্যমে বেদকেও ছাপিয়ে যেতেই পার—"তত্র বেদাঃ অবেদা ভবতি"। অর্থাৎ অবৈদিক আরাধনার মাধ্যমে সাধনাকেও বেদ স্বাগত জানিয়েছে যদি তা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য উন্নত পথ হয়।

বেদ কিন্তু নিরাকার আরাধনাকেই আরাধনা বলেছে সাকারের বিরোধিতা না করেই। আসলে দেবতা নিরাকারেও আছেন আবার সাকারেও তবে উপাসনা বা আরাধনা কিন্তু নিরাকার তত্ত্ব বা সহজ ভাবে বললে অগ্নি সংস্কারের মাধ্যমেই হবে। অগ্নি ও বায়ু এই দুই হল দেবতত্ত্ব। শুক্ল যজুর্বেদ এই দেবতত্ত্ব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছে "তদেব অগ্নিঃ তদ্ আদিত্যঃ তদ্ বায়ুঃ"। অগ্নিকে দেব পুরোহিত বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নির স্তুতি করা হয়েছে কারণ বেদ বলছে অগ্নিই হল দেবতাদের মধ্যে অগ্রণী। এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে অগ্নি সমস্ত সামগ্রী স্বাহা রূপে গ্রহণ করে তা বায়ুভূতে পঞ্চভূতে বিলীন করে। আসলে অগ্নি এবং বায়ু এক্ষেত্রে প্রধান দেবতত্ত্ব বলার কারণ হিসাবে এক সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ছে তাঁর কথায় অগ্নি যখন কোনো কিছুকে দাহ্য করে তখন তার ছাই পড়ে থাকে যা থেকে মাটি এবং বায়ু ছাড়া জল হতে পারে না; বিজ্ঞান মতে আকাশ ধূম্রমান অর্থাৎ ধোঁয়াময় তাই অগ্নি ও বায়ু তত্ত্বের মধ্যেই বাকি তিন তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। তাই অগ্নি ও বায়ু তত্ত্বই মূল। আসলে বেদ এখনও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও বৈদিক ভাবে আরাধনাকে উত্তম আরাধনা বলার কারণ এটাই যে বেদ মূখ্য আরাধনার কথাই বলছে যেখানে অগ্নিহোত্র হলো মূল মাধ্যম। বৈদিক ভাবে ঘৃতাহুতি প্রধান হলেও প্রাচীন ধুনি জ্বালানো বা ধূপ তন্ত্রের (পদ্ধতির) গুরুত্ব বৈদিক ঋষিরাও উপলব্ধি করেছিলেন যার ফলে ধূপ-সামগ্রীগুলি আরো অধিক ভাবে হোম-সামগ্রী রূপে হোমের অঙ্গ হয়ে যায় বিশেষ করে নিত্য অগ্নিহোত্রর ক্ষেত্রে। আসলে আরাধনা পদ্ধতির মূখ্য হল অগ্নিমাধ্যম, অন্যগুলি অঙ্গশক্তি। তাই নিত্য অগ্নিহোত্র বা হোমের মাধ্যমে যেমন দেবপুজো করা যায় আবার ধূপ-দীপ সহকারেও করা যায়। প্রধান বিষয় হল নিত্য আরাধনায় অগ্নির সক্রিয় উপস্থিতি। তা সে হোম-মাধ্যম হোক অথবা ধূপ-মাধ্যম।

যদি সাকার উপাসনার দিকে আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখব আমরা দেবতার উদ্দেশে যা কিছু নিবেদন করছি তা কিন্তু ফিরে পাবার আশায় অনেকটা। কারণ ভোগ প্রসাদ ভোজন যা কিছুই আমরা নিবেদন করি তা কিন্তু আমরা একপ্রকার ধরেই নিই যে পুজোর পরে এটি আমরাই গ্রহণ করব তাই সেই অর্থে এটি প্রত্যক্ষ নিবেদন হল না। একমাত্র অগ্নি পারে যে-কোনো নিবেদিত নৈবেদ্যকে নিরাকারে রূপান্তরিত করতে। ঔষধি, ধূপ সামগ্রী, ঘি যা কিছু অগ্নিতে নিবেদিত হচ্ছে তা সে হোমকুণ্ডেই হোক বা

ধূপপাত্রেই হোক না কেন তা কিন্তু প্রসাদ রূপে আমাদের যা দিচ্ছে তা হল পবিত্র ধোঁয়া এবং ভস্ম। এখানেই অগ্নি উপাসনার সার্থকতা যে যা যা বস্তু অগ্নিতে নিবেদিত হয় তা আর ফিরে আসে না বরং তা অগ্নি মাধ্যমে বায়ুভূতে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। বেদ তাই যে-কোনো উপাসনাকেই অগ্নি মাধ্যমে পূর্ণ করার উপর জোর দিয়েছে। মনে হয় সনাতন সময় থেকে ধুনিপাত্রে ধূপের ব্যবহার আরাধনা তন্ত্রের (প্রাচীন তন্ত্র) যেমন এক বিশেষ দিক ছিল পরেও বৈদিক ভাবে যখন হোম ও যজ্ঞের ব্যবহার শুরু হয় তার বহুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ স্মার্ত মতের বাহুল্যের আগে পর্যন্ত অগ্নি মাধ্যমেই ছিল আরাধনার মূল মাধ্যম যাকে নিরাকার আরাধনা বললে খুব একটা ভুল কখনোই বলা হবে না। স্মার্ত পণ্ডিতরাও এই বৈদিক হোমকে তো রাখলেন তার সঙ্গে ধূপ আরতি অর্চনাকেও রাখলেন। ধূপ ও হোমের বিষয় নিয়ে আগেই কথা বলেছি তাই এখানে আর সেই এক প্রসঙ্গের আলোচনায় যাব না। আসলে পুজো পদ্ধতির বর্তমান দিকটি যদি দেখি তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই ধূপ-দীপ আরতি এবং হোমের ব্যাপারটা নিয়েই বেশি মাথা ঘামান। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা সাকারে পুজো করলেও নিরাকার আরাধনাই কিন্তু এখনও আমাদের সেই মূলে রয়েছে।

নিরাকার উপাসনা একাগ্র সাধক বা পূজকের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ সকল মানুষ এই বিষয়ে আগ্রহী হবে না এটাই স্বাভাবিক। আমরা ভাবতে পারি যে, এটি বোধহয় প্রাচীন সময়ে ছিল এখনই কমেছে তা কিন্তু পুরোপুরি নয় কারণ তাহলে উৎসবের প্রচলন পুজোর আঙ্গিকে এত পুরাতন হত না। যেমন কিছু সংখ্যক মানুষকে মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রচলনের আগে থেকেই দেখে আসছি দুর্গাপুজো বলতে তাঁদের ওই অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলিটুকুই। সেটা যে পুজোর অঙ্গ না হয়ে উৎসবের অভ্যাসের অঙ্গ এটা বোধহয় এখানে বিশেষ ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। ঠিক সেই রকমই ভোগ রান্না রকমারি ভোগ নিবেদন করে মানুষকে না খাওয়ালেও কিন্তু সামাজিক উৎসব টিকবে না। তবে এই সব কিছুর মধ্যেও সাকার আরাধনার নিরাকার রূপটি হারিয়ে যায়নি।

যদি আমরা দুর্গাপুজোর বিধির দিকে তাকাই তাহলেও দেখব যে বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করে আমরা দেবীকে আবাহন করি আবার নবমীর হোম সেই বিল্ব কাষ্ঠেই আমরা হোমাগ্নি জ্বালিয়ে দেবীকে আহুতি প্রদান করি। বোধন থেকে পূর্ণাহুতি পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকে অখণ্ড ধূপাগ্নি বা যাগ প্রদীপ। হোমের শেষে ধূপ দীপে আরতি করে সম্পন্ন হয় শাস্ত্রোক্ত দুর্গা আরাধনা। দেবীকে ভোগ রাগ করে দেবীর পুজো এগুলি কিন্তু দেবীকে সাকার মনে করে কন্যা বা মা মনে করে পুজো করা যা এক প্রকার লৌকিক পুজো বা মানবিক ভাবনা আরোপ করে আরাধনা। কিন্তু অগ্নির মাধ্যমে ধূপ-দীপ মাধ্যমে দেবীর যে পুজো তা কিন্তু দেবীর নিরাকার আরাধনা। অগ্নির তেজ বায়ুর সুগন্ধে অর্থাৎ ধূপ-দীপ-হোমের তেজ ও বায়ুতে সব কিছুই দেবীময় হয়ে

ওঠে। কারণ আগেই বলেছি এই হল প্রত্যক্ষ পুজো। দেবী এখানে আমাদের মা কিন্তু তিনি নিরাকার ব্রহ্মময়ী। আর ব্রহ্ম হল তেজস্বরূপ। তাই সমস্ত সাধকদের কথায় বার বার এ কথাই উঠে এসেছে যে দেবীর একপ্রকার পুজো হয় উৎসবের আঙ্গিকে যা নর নারায়ণ মানুষের সেবার জন্য আর অন্যদিকে শক্তির আধার রূপে পুজো করা। তাই দেবী পুজোতে দীপ, ধূপ, ১০৮ দীপমালা, আরতি, হোম, ধুনা পোড়ানো বা ধূপ হোমের প্রাধান্য। এখানে আমরা বোঝানোর সুবিধার জন্য দুর্গাপুজোর কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী সব আরাধনাতেই কিন্তু মূলে সেই নিরাকার আরাধনাই অর্থাৎ সেই অগ্নি আর বায়ু অর্থাৎ পঞ্চবায়ু তত্ত্ব।

বারাণসীর অন্নপূর্ণা পুজোর ক্ষেত্রে অষ্ট ধূপের ব্যবহার করা হয় সাথে নয় বাতির দীপমালা আরতি এবং এদিন ঘি ও ধূপ (ধুনা, গুগ্গুল) ভিক্ষারূপে দান করা হয়। আমি ভেবেছিলাম এটি তান্ত্রিক পুজো কিন্তু পূজারির কথায় এটি বৈরাগ্যের পুজো। মা অন্নপূর্ণা আসলে ভবানী যিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রদান করেন যা দেবীর প্রণাম মন্ত্রেও উল্লেখিত তাই এই বৈরাগ্য মতেই পুজো। তন্ত্র ভিন্ন পুজো সম্ভব না আর তন্ত্র ক্রিয়ামূলক এবং তা নিরাকার আরাধনার কথাই বলে যদিও সাকার বিগ্রহেও পুজো করা হয়। দেবী অন্নপূর্ণাকে সামাজিক কারণে অন্নদাত্রী রূপে অনেক বেশি প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তিনি যে কাশীধামে বৈরাগ্য প্রদান করতেই তাঁর আসন পেতেছেন এটা অনেকেরই অজানা। পণ্ডিতজির কথায় ধূপ হল বৈরাগ্যস্বরূপ আর দীপ হল জ্ঞান-স্বরূপ তাই এই প্রতীকে দেবীমায়ের পুজো হল সবচেয়ে শুদ্ধ পুজো। আসলে সাকারে যাঁকে প্রত্যক্ষ করছি সেই সর্বশক্তিমান যে বায়ুভূতে আমাদের চারপাশে বিরাজমান তা এই নিরাকার আরাধনার মধ্যে দিয়ে অনেকটাই উপলব্ধি করা যায়।

নিরাকার আর সাকার এর মধ্যে কোনটি সঠিক তা নিয়ে বিরোধ দ্বন্দ্ব বহুদিনের। কিন্তু এই বিষয়টি এক কথায় খুব সহজ সমাধান দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর কথায় আসলে কোনো স্তরে পৌঁছাতে গেলে একটা মত অবলম্বন করতে হয় কিন্তু দেখা যাবে সব মতের সঙ্গেই অন্য মতের কোথাও না কোথাও একটা মিল রয়েছে। যেমন সাকার পুজোর ক্ষেত্রে নিরাকার উপাসনার প্রয়োজন ঠিক তেমনই কিন্তু নিরাকার আরাধনার ক্ষেত্রে অগ্নিতে সাকার বস্তুকেই আহুতি দেওয়া হচ্ছে তা অগ্নি স্বাহার মাধ্যমে নিরাকার বস্তুতে রূপান্তরিত করছে। এই নিরাকার সাধনার ক্ষেত্রে ধূপ নিয়েই কেন আলোচনা করলাম তা কি কেবল বইটির বিষয়ের কারণে! এর উত্তর যদি খানিকটা হ্যাঁ হয়ে থাকে, তবে খানিকটা অন্য বিষয়ও আছে। আসলে আমরা ভোগ, খাওয়া দাওয়া এই সবের পিছনে যত সংখ্যক টাকা খরচ করে পুজোর আয়োজন করি তার এক ভাগও বোধহয় ধূপ বা দীপ আরাধনার ক্ষেত্রে করি না। বড়োজোর রীতি অনুসারে ধুনো জ্বালাতে হবে তাই জ্বালিয়ে দিই বা আরতি করতে হয় তাই ধূপ-দীপ

জ্বালাই। কিন্তু এই আরাধনাই মূল পুজোর অঙ্গ সেটা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। ধূপ ও দীপই হল সেই বায়ু ও অগ্নি তত্ত্বের প্রতীক, ধূপের মধ্যে অগ্নি যেমন অবস্থান থাকেন তেমন এর সুগন্ধিত ধোঁয়া বায়ুর প্রতীক। এই দুই তত্ত্বের মাধ্যমেই আমরা সাকার বিগ্রহে প্রাণবায়ু ও জ্যোতিঃরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে থাকি। ধূপ দীপের আরতিতে তাই শ্রীবিগ্রহ ঘ্রাণপ্রাণে দৃষ্টিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সাগ্নিক ধূপ তন্ত্র ও ধুনুচি ধূপ

এখানে দুটি বিষয়ে আমাদের বোঝার প্রথমেই প্রয়োজন রয়েছে তা হল সাগ্নিক এবং অপরটি হল তন্ত্র। সাগ্নিক হল অগ্নির মাধ্যমে কোনো আরাধনা বা উপাসনা পদ্ধতিকে বোঝায় আর অগ্নি ছাড়া যে পুজো পদ্ধতি রয়েছে তা কিন্তু নিরাগ্নিক। বেশির ভাগের মত এখানে এটাই যে, সনাতন হিন্দু পুজো পদ্ধতি সাগ্নিক, যার প্রকাশ বেদ এবং তন্ত্র দুয়েই আছে। বৌদ্ধধর্ম নিরাগ্নিক এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই পরবর্তী হিন্দুধর্মে নিরাগ্নিকতা আসে। তবে মনে হয় সাগ্নিক এবং নিরাগ্নিক এই দুই ধরনের পুরোহিতই কিন্তু প্রাচীন সময় থেকে ছিল। এর উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া গিয়ে থাকে। যুধিষ্ঠির তাঁর যজ্ঞ কার্যে দুই ধরনের পুরোহিতকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যজ্ঞ সাগ্নিক কার্য এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যদিও। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে ভাবধারার প্রচার করেন তা কিন্তু নিরাগ্নিক উপাসনা বা ভাবনা। এই বিষয়ক অধ্যাপকদের মতে সাগ্নিক হল আরাধনা আর নিরাগ্নিক হল কোনো বিশেষ ভাবধারা মাত্র। নিরাগ্নিক কথার মধ্যেও অগ্নি কথাটি রয়েছে তাই এটি অগ্নিকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে হবে সেটা না ভাবাই ভালো তবে এটি অগ্নি মাধ্যমে আরাধনাকেই একমাত্র আরাধনা মনে করত না। বেদ যেমন নিত্য অগ্নিহোত্র করে আরাধনাকেই মূল বলেছে তন্ত্র মতে তেমনই ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলন ও আরতি হল সাগ্নিক পুজো পদ্ধতির তন্ত্র বিষয়ক সংস্করণ। তবে এই সাগ্নিকতা যে মূলত প্রাচীন লৌকিক ধারার হাত ধরে এসেছে এবার আমরা তন্ত্র বিষয়ক আলোচনার মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

তন্ত্র শব্দটি শুনলেই আমাদের প্রথমেই যেন তান্ত্রিক বিধির কথা মনে আসে। কিন্তু সত্যি বলতে তন্ত্রের উদারতা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি, সে কারণে হয়তো অজানা ভীতির সঞ্চার হয়। আসলে বেদ পুরাণ স্মার্ত বিধান অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে যে অধিকার দেয় না তন্ত্র কিন্তু সেই অধিকার সাধারণ মানুষের আরাধনা পদ্ধতিকে নির্দ্বিধায় দিয়ে থাকে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই তাই বাংলা বিহার ও বারাণসীতে তন্ত্রের প্রভাবেই তা অনেক বেশি সাধারণের মুক্ত পুজো পদ্ধতির রূপ পেয়েছে। আসলে তন্ত্র বলতে আরাধনা পদ্ধতিকে বোঝায় তথাকথিত তান্ত্রিকতাকে

না। তন্ত্র হল সাধারণের লৌকিক পুজো আরাধনারই একটি রূপ যা পরে বিস্তারিত ভাবে আগম গ্রন্থ ও সাহিত্য রূপে সংরক্ষিত হয়েছে। কারণ কোনো পদ্ধতিকে ভবিষ্যতের কাছে তুলে ধরতে গেলে যেমন অভ্যাসের প্রয়োজন থাকে তেমন পুঁথি আকারে তার সংরক্ষণও প্রয়োজন হয়। পদ্ধতিগত অভ্যাস সময়ের সাথে সাথে বদলায় তাই প্রাচীনতাকে জানতে আবার গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। এক কথায় এখানে যদি তন্ত্রের কথা বলতে হয় তাহলে তা হল সাধারণ মানুষের আচার নিয়ম আরাধনা পদ্ধতি। যেমন ধূপ করা এটিও কিন্তু প্রাচীন লৌকিক পদ্ধতি যাকে ধূপ আরাধনা পদ্ধতি বা ধূপ তন্ত্র বলাই যায়। বৈদিক হোমের অনেক আগে থেকেই এই ধূপ বা ধুনির ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীন ধুনিপাত্রগুলি এর সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে। তবে এগুলি যে হোম ক্রিয়ার প্রচলনের আগে এবং পরেও বেশ ভালো ভাবে প্রচলিত ছিল তাতে বুঝতে কোনো সন্দেহ হয় না যখন দেখি হোমেও ধূপ সামগ্রীগুলি আহুতি সামগ্রী রূপে ব্যবহার হচ্ছে এবং হোমের সাথেও ধূপ আর দীপ নিবেদনের কথা বলা হচ্ছে।

আসলে যখন কোনো পুজো পদ্ধতি বা ক্রিয়া পদ্ধতির লিখিত রূপ ছিল না তখন তা কেবল মানুষের নিজের আরাধনার অভ্যাসের মধ্যেই বেঁচে ছিল। যাকে লৌকিক ধর্মই বলা সঠিক। এই লৌকিক ধর্মই কিন্তু কালে তন্ত্র নামে পরিচিত হয়েছে। তন্ত্র হল সেই পদ্ধতি যা চির সনাতন। লৌকিক এই পদ্ধতি বা তন্ত্র কিন্তু অভ্যাসের মাধ্যমেই মূলত বহু কাল ধরে বেঁচে রয়েছে। আগমমার্গীরা তাই মনে করেন তন্ত্র শিক্ষা কখনোই লিখিত রূপে সম্ভব নয় তা অভ্যাস এবং গুরু মুখে শুনেই সম্ভব। অর্থাৎ অনেক নিয়মচার কিন্তু এখনও মৌলিক লৌকিক ধর্মেই রয়ে গিয়েছে তা কিন্তু এই তন্ত্রেরই এক রূপ। বৈদিক পুজো করার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় কিছু বিধি নিষেধ আছে স্মার্ত ও পুরাণের বিধানও অনেক অধিকারই কেবল তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠদের দিয়েছেন। কিন্তু তন্ত্র এই অধিকার সকলকে দিয়েছেন। যা কিনা সাধারণ তন্ত্র বলা যায়। যদি কেউ তাঁর আরাধ্যের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে পারে সে ক্ষেত্রে তন্ত্র তাকে সে অধিকার দেয় তাঁর মতো করে পুজো করার। যদিও বেদ সম্পূর্ণ লৌকিক পুজো পদ্ধতিকে অস্বীকার করে না কখনোই, তবে কিছু বিষয় নিয়ে নির্দিষ্টকরণ আছে। যেমন অনেক স্মার্ত মত এবং পৌরাণিক মত দেবতাকে ভোগ নিবেদন ও যজ্ঞ হোম করার অধিকার উপবীতধারীকেই দিয়েছেন। কিন্তু তন্ত্র এর বিকল্প পথ মানুষকে দেখিয়েছে। এখানে বেদ পুরাণ তন্ত্রের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ সেটি আলোচনা করার বিষয় আমাদের নয় আর সত্যি বলতে আমরা ধূপ তন্ত্র নিয়েই এখানে আলোচনা করব মূলত, কিন্তু তন্ত্র যেহেতু শাস্ত্রাচারও তাই এখানে আলোচনার আগে স্পষ্ট করা হল।

যদি হোমের বিষয়ে দেখি তাহলে বৈদিক এবং তান্ত্রিক হোমের মধ্যে তান্ত্রিক হোম যে অনেকটাই পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ না থাকাই ভালো। আসলে হোম ক্রিয়াটি এবং হোমের মাধ্যমে দেবতাদের হবি নিবেদন সম্পূর্ণ একটি বৈদিক ভাবনা থেকে এসেছে। তন্ত্র বিশারদদের মতে হোম-যজ্ঞ ও ধ্যান এগুলি তান্ত্রিক বিধির মধ্যে পড়ে না। তন্ত্রসাধন মানুষের সাধারণ বিধি নিয়েই। ধুনুচির মধ্যে ধূপ জ্বালানো এবং তা দিয়ে মাতৃপুজো এটি কিন্তু লৌকিক পুজো ও তন্ত্র বিধি। তন্ত্র বিধিতে ধূপ এবং দীপকে যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা বোধহয় অন্য আর কোনো কিছুকে নয়। পুজোতে ধূপাদি দীপ দ্বারা আরতি করা এটি কিন্তু প্রাচীন তন্ত্র যা, লৌকিক ধারা থেকে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। আবার পুজোতে ১০৮ দীপ জ্বালানো অষ্ট ধূপ প্রজ্জ্বলন তাও কিন্তু তন্ত্র। এগুলি সবই ছিল লৌকিক উপাসনার অঙ্গ যা আগম রূপে পরে বিস্তারে সংরক্ষিত হয়েছে। বৈদিক মতের অনেক জায়গাতেই কিন্তু আলাদা করে ধূপ আরতির চলন নেই কেবল দীপমালা দিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে। কারণ তাঁদের মত হোম ক্রিয়াদি হলে সেখানে ধূপ আরতি নিষ্প্রয়োজন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এখনও একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখব যে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে তাঁরা মূলত পুজো করে থাকেন ধুনুচিতে ধুনো জ্বালিয়ে লৌকিক আরতি করে আর অন্য উপকরণ বলতে ওই বন্য ফুল মাত্র। এই ধূপ জ্বালিয়ে তাঁরা আনন্দ করে ঠিক যেমন দুর্গাপুজোতে আমরা ধুনুচি নৃত্য করে থাকি, অর্থাৎ এই ধুনুচি আরতি নাচ যে সেই অতীতের সনাতন লৌকিক ধারারই একটি অঙ্গ তা বোধহয় খুব একটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তন্ত্র মতে সহজ পুজো করা হলে সেখানে ধূপের ব্যবহার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ধুনো পোড়ানো, ধূপ-ধুনো ও দীপে আরতি এগুলি কিন্তু তন্ত্র পুজো বা সেই লৌকিক পুজোর ইতিহাসকেই বহন করে চলেছে। বাংলার বহু জায়গায় এখনও বেশ কিছু এই ধরনের পুজো পদ্ধতি রয়েছে যার মধ্যে এই নিয়ম রয়েছে যে ধূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই দেবীকে পুজো করতে হবে। এই পুজোগুলির বয়স ৫০০ বছরের পুরোনো কিন্তু দুঃখের বিষয় আড়ম্বরহীন এই পুজোগুলো কিন্তু মিডিয়ার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারল না এখনও। কারণ এই পুজোর ধারাগুলি এখনও প্রাচীন তন্ত্র ধারায় অনেক বেশি প্রভাবিত। এই ধরনের পুজোর ধারা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাংলার মধ্যে বীরভূম জেলায় দেখা যায়। নবদ্বীপের এক আগমমার্গী শাক্ত পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলে একটি বিষয় যত দূর বুঝেছিলাম তা ঠিক এই রকম যে আগে শক্তি পুজো অনেক বেশি ঘটে পটে চালু ছিল বাংলার বিভিন্ন অংশে। সেখানে ভোগ নৈবেদ্য বলতে কিছু ছিল না খুবই সাধারণ ভাবে এই ধূপ-দীপে-নৈবেদ্যে পুজো আরতি করেই পুজো হত, কিন্তু বৈষ্ণব পুজোর জনপ্রিয়তাকে খর্ব করার জন্য মহারাজা

কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত পুজোকে এক নতুন রূপ দান করেন। যেখানে ভোগরাগের শক্তি পুজোর প্রচলন হতে থাকে নবদ্বীপ সহ নদিয়া জুড়ে ও বাংলায়। ধীরে ধীরে শক্তি পুজোর সাধারণ দিকটি বদলাতে থাকে আড়ম্বরে। আসলে বৈষ্ণব বিরোধিতার জন্যেই খানিকটা এই ব্যবস্থা হলেও শক্তি পুজোর সহজ সরল দিকটি এতে অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। বর্তমানে আমরা ধূপ-ধুনোর ব্যবহারকে আর সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি না কোথায় খিচুড়ির সাথে লাবড়া আর কোথায় পোলাওয়ের সাথে আলুরদম ভোগ দেওয়া হচ্ছে সেই নিয়েই বেশি ভাবনা চিন্তা করছি। আসলে এখন পুজোর সেই সাধারণ ভাবনাটাই বদলে গিয়ে পুরোটি উৎসবের আকার নিয়েছে যার প্রধান হল এইগুলোই। বাংলার বহু প্রাচীন কালীপুজো এখনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যেখানে প্রাচীন তন্ত্র মেনে পুজো করা হয়। থাকে না কোনো গঙ্গাজল, তুলসীপাতার ব্যবহার, থাকে না কোনো যজ্ঞ, থাকে না কোনো অন্ন ভোগের ব্যবস্থা।

ধুনুচির ব্যবহার আনুমানিক সিন্ধু সভ্যতার আগে থেকে হয়ে আসছে এবং এই ধরনের বহু ধুনি পাত্রের সন্ধান সিন্ধু সভ্যতাতেও পাওয়া গিয়েছে। সে সময় হোম ক্রিয়ার প্রচলন ছিল না কিন্তু অগ্নি সংস্কারের মাধ্যমে পুজোর চলন ছিল। এই প্রাচীন অগ্নি সংস্কারই কিন্তু এই ধুনুচি ধূপের রূপান্তর। তন্ত্র মতে পুজোর ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও নারকেলের জটা যাকে কিনা সহজ ভাষায় নারকেল ছোবড়া বলে থাকি তা জ্বালিয়ে ধুনো-গুগগুল দিয়ে আহুতি প্রদান করা হয় এবং আরতি করা হয়। যদি আমরা সাধারণ গৃহস্থ পুজোর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে দেখব আমরা সচরাচর হোম ক্রিয়া করি না কিন্তু ধুনুচি ধূপের আরতি ছাড়া ভাবতেই পারি না। আসলে ধুনোর ধোঁয়ার মধ্যেই সেই প্রাচীন পদ্ধতি এখনো তার ছাপ রেখেছে।

ঘট স্থাপন করে জোড়া ধুনুচি জ্বালিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে আরতি করা এই প্রথা কিন্তু অনেক অনেক প্রাচীন। এটি কিন্তু প্রাচীন সেই ধর্মবোধকেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যা স্বাধীন ধারার পুজো এবং এই পদ্ধতি বা ক্রিয়াই পরে তন্ত্রোক্ত নামে পরিচিত হয়েছে। বৈদিক ধারা কিন্তু এই সমস্ত ধারাকে লুপ্ত করতে পারেনি বরং অন্য ভাবে তাঁরাও এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আসলে এখনও অন্নপূর্ণা পুজো, লক্ষ্মী পুজোর মতো কিছু পুজোতে এই ধরনের বেশ কিছু নিয়ম দেখা যায় যেমন জোড়া ধুনুচিতে দেবীর পুজো এবং কেবল ধুনুচি ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপেই আরতি। তন্ত্র বিশারদদের মতে এখন অনেকেই অনেক দীপমালায় আরতি করে থাকেন বটে তা কিন্তু নেহাৎ দেখার সৌন্দর্যের জন্য মাত্র, যেমন ধূপ কাঠি ব্যবহার করেও আরতি করা যায় না। ধুনুচিতে ধূপ জ্বালালে তা হল শক্তি রূপ অগ্নি অর্থাৎ ধূপ অগ্নিতে শিব রূপ হবি আহুতি আবার লক্ষ্মী রূপ ধূপাগ্নিতে বিষ্ণু রূপ হবি আহুতি। আসলে এটি সৃষ্টি ও প্রজনন

তত্ত্বের প্রতীক যা মনে হয় তন্ত্রের মূল ভাবনার মধ্যেই এটি নিহিত। কারণ মানুষের সংসার না থাকলে দেব আরাধনার কোনো জায়গাই থাকে না।

ধুনুচির ধূপ আরাধনা ঠিক তার জায়গা করে নিতে পারেনি এর সবচেয়ে বড়ো কারণ যা মনে হয় ধোঁয়া খেয়ে তো সকলের পেট ভরবে না তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ যতই ক্ষমতা সম্পন্ন হয়েছে এই সব সহজ আরাধনা কোণঠাসা হয়েছে। একটা সময় এমন ছিল যে পুরোহিত তন্ত্রের উপর নির্ভর করেই অনেকের জীবিকা চলত এবং সমাজেও তাই পুরোহিত তন্ত্রের প্রভাব খানিক বিস্তার করে রাখতেই চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমানে তো আর ব্রাহ্মণ হলে শুধু পৌরহিত্য করাই তাঁদের কাজ না, যুগের সাথে পা মিলিয়ে ব্যবসা চাকরি সবেতেই তাঁরা পা মেলাচ্ছে। ধরেও যদি নিই যে ভোগ বা চালের যে-কোনো নৈবেদ্য ব্রাহ্মণ ছাড়া নিবেদন করা যায় না তবে এটাও তো ঠিক যে ভোগ নৈবেদ্য বাদেও নিবেদনের অনেক বস্তুই আছে যা কিন্তু কোনো নিষেধের আওতায় পড়ে না। আর নৈবেদ্য বলতে তো নিবেদিত সকল দ্রব্যকেই বোঝায়। ধুনুচি ধূপ-দীপ নিবেদন এগুলিতে কিন্তু আচণ্ডাল শুদ্রেরও সমান অধিকার। তাই যদি ব্রাহ্মণ অধিকার না ভেঙেও অব্রাহ্মণরা তাঁদের পুজো করতে চান নিজের হাতে, তাতে বাধা কোথাও নেই। লৌকিক এই প্রথাকে কিন্তু তন্ত্র সকলের জন্য সমান অধিকার দিয়েছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীর শ্লোকেও "অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ" অর্থাৎ ধূপাগ্নি তর্পণে পুজো করার কথা পাচ্ছি। আসলে সাধারণেও আরাধনা অভ্যাসের ক্ষেত্রে উদাসীন তাই কেবল পুরোপুরি পুরোহিত তন্ত্রকে দোষারোপ করাও যায় না।

একবার এক তান্ত্রিক হোম দেখাবার সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে যা দেখেছিলাম তা হল পুরো হোমটাই কিন্তু কাঠ দিয়ে নয় বরং করা হয়েছিল নারকেলের ছোবড়া সহযোগে। যদিও তার মধ্যে চন্দনের দেবদারুর ছোটো কিছু কাঠ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু মূল রূপে তা কিন্তু করা হয়েছিল নারকেলের ছোবড়া দিয়ে। এই বিষয়ে পরে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন সেই উত্তরপ্রদেশী শাক্ত ব্রাহ্মণ জানিয়েছিলেন যে এটিই হল বৈদিক এবং তান্ত্রিক হোমের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য। বৈদিক হোম কাঠের ব্যবহার করেই মূলত করা হয়ে থাকে কিন্তু তান্ত্রিক হোম যেহেতু ধুনি হিসাবে জ্বালানো হয়, তাই ছাল-বাকল-ছোবড়া এই সব বস্তু দিয়েই জ্বালানো হয়ে থাকে। এখানে আহুতি দেওয়া হয়ে থাকে রাল (ধুনো), গুগগুল, অগরু, চন্দন এই সব। এই হোম থেকে অগ্নি নিয়েই কিন্তু আরতির ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করা হয়ে থাকে। মনে হয় সেই ধুনুচি ধূপের আদি ব্যবহারই এই তন্ত্র হোমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। যদিও এখন তান্ত্রিক হোম কাঠেও হয়ে থাকে সেখানে তন্ত্রের বীজ মন্ত্রের ব্যবহার হয় মাত্র। এই ধুনুচি ধূপ আরতির আগে কিন্তু অনেক জায়গাতেই দুর্গা পুজো, অন্নপূর্ণা পুজোতে ধূপ জ্বালিয়ে তাতে ধুনো দিয়ে আহুতি দিয়ে তারপর তা

দিয়ে মায়ের আরতি করা হয়। আসলে আধুনিক ধূপকাঠির প্রচলনের সাথে সাথে এই ধূপ ক্রিয়া অনেক ঢাকা পড়ে গিয়েছে। যখন খুব সহজ পদ্ধতি আমাদের কাছে চলে আসে তখন সামান্য পরিশ্রমের পদ্ধতিটা আমাদের কাছে ঐচ্ছিক হয়ে পড়ে। আসলে যাঁরা পূজারি বা পৌরহিত্য করেন তাঁরাও এই বিষয়টিকে নিয়ে অত মাথা ঘামাননি বলেই আন্দাজ, কারণ এটিতে কম বেশি হলে তেমন কিছু যায় আসে না সেই অর্থে।

তন্ত্রমতে ধূপ জ্বালানোর ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধুনো জ্বালিয়ে দিলাম আর হয়ে গেলো সেটা সঠিক নয়। সে ক্ষেত্রেও আগে ধুনচিটিকে পুজো করা হয় গন্ধ-পুষ্পে তারপর অগ্নিতে দেবীকে বা যে দেবতার পুজো করা হচ্ছে তাঁর নামাগ্নিতে ধূপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়। এবার আটবার তার মধ্যে ধূপ দেওয়া সেই দেবতার নাম করেই তারপর তা দিয়ে আরতি করা হয়। অর্থাৎ এক অর্থে যজ্ঞ ধূপ দিয়ে আরতি করা।

ধুনুচির এই প্রাচীনতার সম্মান এখনও তন্ত্র তাকে অনেকটাই দিয়ে রেখেছে, অন্যরা হয়তো সেই অর্থে লৌকিক আচারের দোহাই দিয়ে তাকে না ফেলে দিলেও খানিকটা দূরে দূরেই রেখে দিয়েছে। আসলে নিজের পুজো নিজে করার ক্ষেত্রে এখনও কিন্তু ধুনুচি ধূপ বা প্রদীপের কোনো বিকল্প নেই। কারণ লৌকিক, বৈদিক, তন্ত্র, স্মার্ত, পুরাণ এমনকি সাধারণ পুরোহিতদর্পণ পুজো পদ্ধতি গ্রন্থ কোনো কিছুই এটিকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। তবে লৌকিক পরম্পরা এবং তন্ত্র মত এটিকে যে সম্মান দিয়েছে তা অন্য কেউ সেভাবে দিতে পারেনি। তন্ত্র কিন্তু কেবল তন্ত্র সাধকদের সম্পত্তি নয় তা গৃহস্থেরও পালনীয়। কারণ তন্ত্র সকলের জন্যই আলাদা আলাদা ভাবে তার প্রকাশ রেখেছে। আর তন্ত্রের মূল ধারা তো সেই ধর্মীয় লৌকিক ক্রিয়া থেকে তবে তা কেবল কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হবেই বা কেন। আসলে এর পিছনে ভয় আর না জানাই হল মূল বিষয়। ধূপ-তন্ত্র হল সাগ্নিক আরাধনা যা ধুনুচি ধূপের মাধ্যমে হয়ে আসছে প্রাগৈতিহাসিক আরাধনা পদ্ধতির সময়কাল থেকেই। দেবী পুজোতে সর্বভূতের জন্য এই ধুনুচি ধূপ নিবেদনের এক শ্লোকে তাই বলা হচ্ছে "বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্বভূতানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।"। অর্থাৎ দিব্য বনস্পতির রসযুক্ত ধূপ সর্বভূতকে সুগন্ধিত করুক।

ধূপবিলাস ও অনুবাসন

ধূপবিলাস ঠিক পুজোর বিষয় নয় এটি হল সুগন্ধী দ্রব্য আদি ধূপিত করে দেবতাদের আনন্দ প্রদান করা, তাই দেবতাদের শৃঙ্গার বা সজ্জাদির পর ধূপাদি প্রদান করে ধূপ-বিলাস করা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পরম্পরায় বিশেষ করে এই ধূপবিলাস দেখা যায় আবার বেশ কিছু শাক্ত মন্দিরেও ধূপ আরতির মাধ্যমে এই ধূপবিলাস করা হয়। দক্ষিণেশ্বরের কালিকা মন্দিরে মায়ের স্নান ও সাজ-শৃঙ্গার করবার পর ধূপারতি করা হয় নিত্য। এই ধূপবিলাস যখন উপচার হিসাবে নিবেদিত হয় তখন তাকে বলা হয় 'অনুবাসন'। অনুবাসন শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সুগন্ধ দ্রব্যাদি মাধ্যমে ধূপিত বা ধূপবাসিত করা। আসলে যদি তন্ত্র গ্রন্থাদির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো ধূপ নিবেদনের একটি পদ্ধতি হচ্ছে যেভাবে আমরা সাধারণত দেখে থাকি অপরটি অনুবাসন মাধ্যমে নিবেদিত হচ্ছে।

আগমে বহু অংশে ধূপ ও দীপ নিবেদনকে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ সমান বলেছে আবার নানা সুগন্ধী দ্বারা ধূপ করলে তা সর্বকামফলপ্রদ বলা হয়েছে। দক্ষিণ প্রদেশে ধূপ নৈবেদ্য ও ধূপ অনুবাসন দুই ভাবেই ধূপ নিবেদন বিধি দেখা যায়, ধূপ অর্চনের মাধ্যম্যে সুগন্ধী অনুবাসন প্রক্রিয়া দেখা যায়। এক্ষেত্রে নানা ধূপ সামগ্রী নিয়ে তা একুশবার বা একশত আটবার প্রদর্শন করা।

লক্ষ্মীতন্ত্রে অনুবাসন মন্ত্রে বলা হচ্ছে "ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।" অর্থাৎ যজ্ঞীয় ধূম্রের মাধ্যমে বা বলা ভালো সুগন্ধী যজ্ঞ সামগ্রীর মাধ্যমে ধুনুচি ধূপ প্রজ্জ্বলন করে ধূপিত করা। ধূপের এই নানা উপচার নিবেদন বহু তন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়, বিশেষ করে চৌষট্টি উপচার আদি নিবেদনের ক্ষেত্রে ধূপের অনেকগুলি ভাগ ছিল যা বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলা চলে। যেমন ধূপ ঔষধী হিসাবে নিবেদন, ধূপ সামগ্রী দিয়ে ধূপ নৈবেদ্যম, ধূপ জ্যোতিষ্টোম রূপে দেওয়া, অনুবাসন

হিসাবে সুগন্ধী প্রদান ও ধূপাদি দ্রব্য ঘি সহযোগে আরতি। বর্তমানে ধূপ নিবেদনের সঙ্গেই অন্যগুলি প্রায় মিলে মিলে গিয়েছে যা আসলে ধূপ গন্ধ নিবেদনই, আলাদা ভাবে কেবল ধূপ আরাত্রিক রয়েছে। ধূপ হোম হিসাবে সংক্ষিপ্ত প্রতীকী হোম করার চলন রয়েছে সেটিকে সামগ্রী আহুতি প্রদান বলা অধিক শ্রেয়। ধূপ সমগ্র উপচারের ক্ষেত্রেই আবশ্যক তা সে পঞ্চ হোক বা চৌষট্টি। কুলাচার বা লৌকিক সেবার মাধ্যমে ধূপসেবা ও ধূপবিলাসের প্রচলন রয়েছে যাঁর ঐতিহ্যও বর্তমানে সীমিত হয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু বৈষ্ণব পুজোতে এখনও ধূপ অনুবাসন করার প্রচলন রয়েছে।

ধূপবিলাস বা ধূপ অনুবাসন নিবেদনের ক্ষেত্রে সুগন্ধী কার্য যেমন চন্দন, দেবদারু, অগরু এগুলির ব্যবহার অধিক করাই নিয়ম, সঙ্গে সরল গুগ্‌গুল, নানা গাছের ছাল, উন্নত মানের ধুনো (পীত শালরস) ও কপিলা ঘৃত ব্যবহার করা হয়। ধূপ নৈবেদ্যম বা নিবেদনের ক্ষেত্রে যেমন শর্করা বা গুড় ব্যবহার করা হয় ধূপ অনুবাসনের ক্ষেত্রে তা করা হয় না। এক্ষেত্রে কেবল ষোলো প্রকার সুগন্ধী ধূপ দ্রব্য ব্যবহার করা হয় যা ষোড়শাঙ্গ ধূপ।

দেবী বা দেবতাদের সঙ্গীরা বা বলা ভালো সখীরা অনেক জায়গায় ধূপবিলাস করছেন তাঁদের এমন বেশ কিছু পটচিত্র ও মূর্তি দেখা যায়, যেমন দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অনেক প্রতিমাতেই দেবীর সঙ্গেই অবস্থান করেন ও তাঁদের একজনের হাতে ধূপপাত্র ও একজনের হাতে চামর দেখা যায়। বেশ কিছু জগদ্ধাত্রী প্রতিমার একই কাঠামোতে দেবী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে সখী জয়া ধুনুচি হাতে ধূপ সুগন্ধী দিয়ে দেবীর ধূপবিলাস করছেন ও অপর সখী বিজয়া চামর ব্যজন করে ব্যজন সেবা করছেন। রাধিকার অষ্টসখীদের মূর্তিতেও দেখা যায় এক সখী ধূপ-সুগন্ধী দিয়ে বিলাস করছেন কেউ পুষ্পমালা দিয়ে কেউ চন্দন লেপন দিয়ে আবার কেউ চামর ব্যজন করে। লক্ষ্মীনারায়ণ পুজোর আদি মূর্তিতেও দেখা যায় গরুড় দেব ধূপ করছেন ও দেবর্ষি নারদ চামরবিলাস। উত্তর ভারতীয় রাম দরবারের ছবিতেও এই ধূপ-বিলাস করার দৃশ্য দেখা যায়। বাংলার পটচিত্রে এই ছবি অনেকভাবে ফুটে উঠেছে। অনেক শৈব ভক্তের মতে ভোলানাথের গাঁজা সেবন আসলে ধূপ-ঔষধী সেবন কারণ ধুনুচি প্রজ্জ্বলনের পদ্ধতিতে বর্তমানে ওটি করা হয় কিন্তু আদিতে এটি ধূপ-ধূম্র বিলাসেরই অঙ্গ ছিল যা বর্তমানে অন্য ভাবনার রূপ পেয়েছে। নন্দী-ভৃঙ্গি দুই সহচর বা বলা ভালো বাবা মহেশ্বরের দুই সেবক বাবার ধ্যানে তন্ময়তার জন্য এই ধূপের সেবা দিয়ে থাকে যা বর্তমানে কল্কে ও গাঁজায় পরিণত হয়েছে। ধ্যানের সময় ধূপের সুগন্ধী ধোঁয়া মনকে উচ্চতায় ধরে রাখতে সহায়ক বলে নানা গবেষণাও বলছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও এ বিষয়ে সমান মত যে ধূপের সুগন্ধী মনকে উচ্চতায় উঠতে সাহায্য করে। আমাদের প্রাচীন উপচারের অনেক কিছুই এখন অতি সংক্ষিপ্ত ও

কেবলমাত্র উৎসব পালনের পুজো হয়ে ওঠার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে বা একটার মধ্যেই অনেক উপচারের বিলয় হচ্ছে বলা চলে, ধূপ অনুবাসনও তার মধ্যে একটি। কিন্তু এই প্রাচীন মূর্তি শৈলী ও পটচিত্রের মধ্যেই শাস্ত্রীয়ভাবে ও লৌকিকভাবে অনুবাসন-ধূপবিলাসের চিত্র আমরা পেয়ে থাকি যা এর প্রমাণ বহন করছে যে, উপচার ও সেবা পদ্ধতিগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এক সময়ে।

অনুবাসন ধূপ প্রজ্জ্বলন করার জন্য ঘি-বাতি অথবা ঘি মিশ্রিত পাটকাঠি ও দেবদারু কাষ্ঠ দিয়ে করা হয়ে থাকে। অনুবাসন ধূপের বা ধূপবিলাসের ধূপের ধূম্র ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী হবে অর্থাৎ একবারে অনেক ধোঁয়া নয়। ধীরে ধীরে সুগন্ধী ধোঁয়া ধূপিত হবে ও সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। ধূপবিলাস ও অনুবাসনের জন্য যে ধূপপাত্র ব্যবহার করা হবে তা পিতলের হওয়াই সঠিক। অনেকে রূপোর ধুনুচি ব্যবহার করেও অনুবাসন করে থাকেন। অনুবাসনের ক্ষেত্রে অষ্টাঙ্গ ধূপ ও অষ্টগন্ধাদি দ্বারা ধূপবাসিত করা হয়। ধূপবিলাস এবং অনুবাসন উপচার নিবেদনের ক্ষেত্রে সুগন্ধী প্রদান করে ধূপিত করাই মূল পদ্ধতি যা ছাল-বাকল-ছোবড়া নানা সুগন্ধী কাষ্ঠ ও নির্যাস যেমন ধুনো গুগ্‌গুল ব্যবহার করাই বিধেয়।

আদি দেব শিবের মন্ত্রে বলা হচ্ছে "সুগন্ধী পুষ্টিবর্দ্ধনম" অর্থাৎ সুগন্ধ যা আধ্যাত্মিক পুষ্টি বা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। শিব পুজো সৃষ্টির আদি আরাধনা, যার মধ্যে অনুবাসন বা সুগন্ধী বিলাসের বিষয়টি বারং বার নানা ভাবে পেয়ে থাকি। শক্তিপুজোর ক্ষেত্রেও ধূপারতি ধূপবিলাসের প্রতীক রূপে এখনও বিদ্যমান। ধুনুচি আরতির যে বর্তমান পদ্ধতি আমরা দেখে থাকি তা আরাত্রিকের মাধ্যমে সুগন্ধী বিলাস একপ্রকার। আগেই বলেছি যে ধূপের নানা উপচারের স্বতন্ত্রতা মিলেমিশে গিয়েছে। অনুবাসন পদ্ধতি শাস্ত্র স্বীকৃত ও স্বতন্ত্র।

অনুবাসন মন্ত্রে বলা হয়েছে "এষ অনুবাসং ধূপ সমর্পয়ামি," "এষ ধূপচী ধূপ অনুবাসেন নিবেদয়ামি," "ওঁ অমুক দেব/ দেব্যৈ অনুবাসেন পূজয়ামি", "এষ অনুবাসেন ধূপ আঘ্রপয়ামি"। নিজের নিজের কুলাচার অনুসারে ধূপ অনুবাসনের এই নিবেদন মন্ত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কুলাচার ও কৌলাচার সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ এবং ক্ষিতি হল কুল। জীবপ্রকৃত্যাদি এই সবের প্রতি ব্রহ্মবুদ্ধিতে নির্বিকল্প যে আচরণ তাই সাধারণ ভাবে কুলাচার নামে পরিচিত। এক কথায় সহজভাবে বললে বলতে হয় বংশের নির্দিষ্ট পরম্পরাগত আরাধনা ও সাধনার আচারই হলো কুলাচার। গুরু পরম্পরার আরাধনার মার্গে এটিই কৌলমার্গ। ধূপ অনুবাসনের জন্য সুগন্ধী দ্রব্য ধুনুচি বা বলা ভালো পিতল ধুনুচিতে প্রজ্জ্বলন করেই ধূপবাসিত করতে হবে। বর্তমানে কেবলমাত্র কুলাচার ও কুলমার্গের আরাধনাতেই এই আরাধনা পদ্ধতি বজায় রয়েছে, কিন্তু এটি

সর্বসাধারণের জন্যই যে উন্মুক্ত এক আচার পদ্ধতি তা এখনও বেশীরভাগেরই অজানা। যে-কোনো পুজোর ক্ষেত্রেই ধূপ অনুবাসন সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধি মেনেই সকলে নিবেদন করতে পারেন। পূজা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ততা ও উৎসব সর্বস্বতার কারণে উপচার নিবেদন বিধিও মাত্র ষোড়শে আবদ্ধ হয়েছে এবং বহু স্বতন্ত্র উপচার হারিয়ে যাচ্ছে। ধূপ অনুবাসনের মতো স্বতন্ত্র পদ্ধতিগুলি হারিয়ে গেলে তা পূজো সংস্কৃতির একটি ধারাকেই লুপ্ত প্রায় করে দেবে তাই সাধারণেরই উচিত এই স্বতন্ত্র ধারা গুলিকে পালন করে রক্ষণ করা।

ধূপ আরাত্রিক সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

"ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাম্ চ প্রবন্দতে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরংপদম্।।"—বিষ্ণু ধর্মোত্তর

যিনি শ্রদ্ধা সহকার ধূপ এবং আরতি করেন অথবা মাত্র দর্শন করেন তিনি শ্রীবিষ্ণুর সবচেয়ে প্রিয় পাত্র হয়ে তাঁর পরম পদ লাভ করেন। এই পরম পদ বলতে আসলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানকেই বোঝানো হয়েছে। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ধূপ অর্চন এবং আরতির মাধ্যমে পরমেশ্বরের আরাধনার কথা বলা হয়েছে যা তাঁর নিকটবর্তী হবার অন্যতম সহজ মাধ্যম। এই আরতি করার সঠিক পদ্ধতি নিয়েই এখানে সরল ভাবে বর্ণনা করা হল যা যে-কেউ চাইলে সহজেই অন্য কারুর সহায়তা ছাড়া নিজেই করতে পারবেন।

ধূপ আরাত্রিক হল ধূপ আরতি যা আসলে ধূপ এবং দীপ সহযোগে করা হয়ে থাকে। আসলে আরাত্রিক মূলত পাঁচ উপচারে করা হয়ে থাকে যার মধ্যে ধূপ, দীপমালা, সজল শঙ্খ, পুষ্প, পত্র অথবা বস্ত্র, চামর মূলত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে বা সময়ের অভাবে এই আরতি এবং নিত্য পুজোর ক্ষেত্রে সাধারণত আরতি করা হয় ধূপ-প্রদীপ দিয়েই। এটিকেই ধূপ আরতি বা ধূপ আরাত্রিক বলা হয়। অনেকে মঙ্গল আরতির সময়ের ধূপ আরতিকে মঙ্গল ধূপ আরতি, পূজা সময়কার ধূপ আরতিকে পূজা ধূপ আরতি, মধ্যাহ্নের সময়কার ধূপ আরতিকে মধ্যাহ্ন ধূপ আরতি ও সন্ধ্যা সময়কার ধূপ আরতিকে সন্ধ্যা ধূপ আরতি বলে থাকেন। অনেকেরই মতে ধূপ ও দীপমালার আরতি এবং প্রণাম এটাই হল সঠিক পদ্ধতি আরতির অন্য উপচারগুলি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক হলেও তা পরে এসেছে। এর পিছনে যুক্তি যা দেওয়া হয় তা হল পঞ্চতত্ত্ব হল মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন কিন্তু দেবতারা হবি বা নৈবেদ্য গ্রহণ করে থাকেন অগ্নি এবং বায়ু তত্ত্বের সংযুক্ত মাধ্যমে তাই এটি হল দেবতত্ত্ব। সে কারণে ধূপ আরতিকে পূর্ণ আরাধনা বলা হয়ে থাকে। আসলে মনে হয় এই ধূপ এবং দীপ আরতি পদ্ধতিটিই সর্ব প্রাচীন বা আদি, কারণ আরতি যখন লৌকিক ক্রিয়া থেকে বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রে সমাদৃত হল তখন কিন্তু ধূপ এবং

দীপমালা নিবেদনের মন্ত্রের ব্যবহারই প্রধানত করা হয়েছে কারণ এখন পর্যন্ত এই দুটি নিবেদনের মন্ত্রই সম্পূর্ণ, বাকিগুলি কেবল জলের ছিটে দিয়ে প্রোক্ষণ করে দেবতাকে দেখানো হয় মাত্র।

ধূপ নিবেদন অর্থাৎ ষোড়শ উপচার বা পঞ্চ উপচারে বা সপ্ত উপাচারে পুজোর ক্ষেত্রে যে ধুনুচি ধূপ নিবেদন করা হয়ে যাবে তা দিয়ে আরতি করা সেই অর্থে সঠিক নয় তবে সকলে না জানার কারণে প্রধানত একটি ধুনুচিরই ব্যবহার করে থাকেন তাই নিবেদিত ধুনুচিটাই আবার ধূপ আর ছোবড়া দিয়ে জ্বালিয়ে তা দিয়েই আরতির জন্য নিবেদন করা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় ধূপকাঠি নিবেদন করে আরতির সময় আরতি করেন এটিও কিন্তু সেই অর্থে সঠিক পদ্ধতি নয়। ধূপ আরতির ক্ষেত্রে ধূপ নিবেদন করে আরতি করে দীপমালা অর্থাৎ অন্তত পঞ্চপ্রদীপে আরতি করা আবশ্যক নইলে আরতি কখনোই সম্পূর্ণতা পায় না। অনেকেই শুধু ধূপ বা এক দীপ দিয়ে আরতি করে থাকেন কিন্তু সেটি আরতি নয় সেটি ধূপ, দীপ দেখানো বলা যেতে পারে। আরতিতে অন্তত বায়ুতত্ত্ব অর্থাৎ ধূপ এবং অগ্নি তত্ত্ব হিসাবে দীপ থাকতেই হবে। ধূপের পরে দীপের আরাত্রিক করেই আরতি আরাধনার সম্পূর্ণতা।

ধূপ নিবেদন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই ধূপ জ্বালিয়ে নিবেদন করে দিলাম তা হয় না। যদিও ধূপ জ্বালিয়ে ও দীপ অথবা কর্পূর জ্বালিয়ে মঙ্গল প্রার্থনার মাধ্যমে মঙ্গল ধূপ অর্থাৎ প্রারম্ভ আরতি করা যেতে পারে। এটিকে অনেকে মাঙ্গলিক আরতি বলেন আবার মঙ্গল আরতিও, তবে এটিকে প্রারম্ভিক বা সূচনা আরতি বলাই বোধহয় অনেক বেশি শ্রেয়। এই আরতির ক্ষেত্রে নিবেদনের প্রয়োজন হয় না সেই অর্থে। ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে প্রথমে জলশুদ্ধি, আচমন ও সামগ্রী পবিত্রীকরণ গন্ধার্চন করে নেওয়া প্রয়োজন। এরপর আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প ও অক্ষতে আরাধ্যের পুজো করতে হবে তারপরেই ধূপ নিবেদন করতে হবে। গন্ধ পুষ্প দিয়েও পুজো করা যায়। গন্ধ বলতে ঘষা চন্দন আর ধূপকেই বোঝায় যা বনস্পতির বিশুদ্ধ সুগন্ধ যুক্ত। পঞ্চ উপচার পুজোর ক্ষেত্রেও কিন্তু গন্ধ পুষ্প অক্ষত দিয়ে পুজো করে ধূপ-দীপ নিবেদন করে ভোগ নৈবেদ্য ও পানার্থ প্রদান করতে হবে। যে-কোনো ক্ষেত্রেই ধূপ-দীপ নিবেদন করার পর আচমন পাত্রের জলে হাত ধুয়ে নেওয়াই বিধেয় ও দেবতাকেও আচমনীয় জল প্রদান করা।

ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে প্রথমে আচমন পাত্র বা কোশাকুশির ত্রিপত্রের মাধমে জলের ছিটে দিয়ে বলতে হয় "এতস্মৈ (দেবী পুজোর ক্ষেত্রে এতস্যৈ) বং ধূপায় নমঃ।" এবার চন্দন পুষ্প নিয়ে বলতে হবে "এতে গন্ধ পুষ্পে ধূপায় নমঃ" এবার আবার গন্ধ পুষ্প নিয়ে বলতে হবে "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এবার আবার গন্ধ পুষ্প নিয়ে সমর্পণ করে বলতে হবে "এতদ সম্প্রদানয়ে

অমুক দেবায়/দেব্যৈ নমঃ"। এবার বলতে হবে "বনস্পতি রস দিব্যো গন্ধ্যাঢ্য সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম" "এষঃ ধূপঃ অমুক দেবায়/ দেব্যৈ নিবেদয়ামি।।" এই ভাবে ধূপ নিবেদন করে তা আরতির মতো সাতবার আবর্তন করা উচিত ধূপপাত্র নিয়ে। অনেকের মতে এই আবর্তন দশবার হওয়াই সঠিক, তবে ধূপ নিবেদনের পর অন্তত কম করে সাতবার আবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। ধূপের পর দীপ নিবেদনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে দীপ নিবেদন করে সাতবার আবর্তন করতে হবে।

ধুনুচি ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে দুটি ধুনুচিতে ধূপ প্রদানের কথাও বলা হয়ে থাকে। ধূপ যে পাত্রে নিবেদিত হবে সেই পাত্রে অর্থাৎ ধুনুচিতে আবার নিবেদন করে আরতি করা সঠিক নয় কারণ সেটি ইতিমধ্যে নিবেদিত। যদিও একটি ধুনুচি থাকলে তা ধুয়ে আবার আরতির জন্য নিবেদন করা যেতে পারে। এই বিধি আজকাল মানা হয়না বললেই চলে, ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে ধূপকাঠি নিবেদন করে আরতির ক্ষেত্রে ধুনুচিতে আরতি করা হয়ে থাকে যদিও এটি সঠিক নয় কারণ ধূপকাঠি দিয়ে কখনোই ধূপ নিবেদন হবে না। এ বিষয়ে এক তীর্থ পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলায় তিনি জানিয়েছিলেন ধূপ নিবেদনের ধূপপাত্রেই আরতি করা যেতে পারে যদিও তা মন্ত্রের দ্বারা নিবেদনের পূর্বে শুদ্ধি করে নেওয়া প্রয়োজন। অপর এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের কথায় এই সব নিয়মের ক্রিয়ার মধ্যে যদি ভক্তিরস মিশ্রিত হয় তবে তা আরাধ্য দেবতা কোনোরূপ বিচার না করেই গ্রহণ করে নেন।

এবার আসা যাক আরতির ধূপ পঞ্চপ্রদীপ নিবেদনের বিষয়ে। এখানে আবারও উল্লেখ করি যে ধূপ আরতি বলতে কিন্তু ধূপ এবং দীপের আরতিকে বোঝায় কেবল মাত্র ধূপ দিয়ে ঘণ্টা বাদ্য সহকারে আবর্তন কিন্তু আরতি হবে না। আরতি ধূপ এবং দীপের সাহায্যেই সম্পূর্ণ হয় বায়ু তত্ত্ব ও অগ্নি তত্ত্বের মাধ্যমে। শুধু মাত্র ধূপ দিয়ে আরতি তাই যেমন হবে না আবার কেবল দীপ দ্বারাও আরতি হবে না। প্রথমে ধূপ দিয়ে আরতি ও তারপরে দীপ দ্বারা আরতি আবার অনেকেই প্রথমে দীপ আরতি করেন তারপর ধূপ দিয়ে। এটি যদিও সঠিক নয় কারণ বৈদিক, আগম, স্মার্ত ও লৌকিক সমস্ত বিষয়েই আছে ধূপ ও দীপ, কখনোই দীপ ও ধূপ নয়। কারণ হিসাবে বলা হয় ধূপ বৈরাগ্যের প্রতীক ও পাঁচটি আরতির দীপমালা হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতীক।

আরতি করার জন্য প্রথমে ধুনুচি, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্পপাত্র প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিন। আরতির ক্ষেত্রে ধুনুচি জ্বালানোর প্রক্রিয়া একই থাকবে কিন্তু এক্ষেত্রে ধূপপাত্র এবং পঞ্চপ্রদীপকে মণ্ডল অঙ্কন করে তার উপর রাখতে হবে। ধূপপাত্র অর্থাৎ ধুনুচি দেবতার বাম পাশে বা অগ্রে ও প্রদীপ দেবতার ডান পাশে রাখাই সঠিক তবে

অনেকেই অনেক সময় স্থানাভাবে দেবতার সম্মুখেই রাখেন। ধূপ ও আরতির দীপ আরতি শুরুর পূর্বেই এক সাথে প্রজ্জ্বলন না করাই শ্রেয়। আরতির ধূপ আর দীপ প্রথমেই এক সাথে নিবেদন করে নেওয়া যায় আবার একটি শেষ করেও অপরটি দিয়ে আরতি করার সময় তা নিবেদন করা যায়। অনেক সময় প্রথমটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রে নিবেদন করা হয় পরের আরতির বস্তুগুলি কেবল শোধন বা জল প্রক্ষালন করেই আরতি করা হয়। আরতির ধূপ নিবেদনের ক্ষেত্রে প্রথমে বলতে হবে "এতস্মৈ বং প্রজ্জ্বলিত আরাত্রিক ধূপায় নমঃ" (দেবী পুজোর ক্ষেত্রে এতস্যৈ বলাই বিধেয়)। এরপর গন্ধ পুষ্প নিয়ে বলতে হবে "এতে গন্ধ পুষ্পে প্রজ্জ্বলিত আরাত্রিক ধূপায় নমঃ"। এবার "এতে গন্ধপুষ্পে এতদ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ"। এরপর "এতদ সম্প্রদানায় অমুক দেবায়/ দেব্যৈ নমঃ"। এবার ধূপপাত্র স্পর্শ করে বলতে হবে "বনস্পতি রস দিব্য গন্ধাঢ্য সুমনোহরা। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম"।। এবার বলতে হবে "এষ আরাত্রিক ধূপ অমুক দেবায়/ দেব্যৈ নিবেদয়ামি।" এরপর আরতি করতে হবে। যদি সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আরতি করা হয় তাহলে প্রথমে আরাধ্যের পদতলে চারবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার ও সর্বগ্রাত্রে সাতবার আবর্তনের মাধ্যমে আরতি করা উচিত। তবে আরতির বিষয়টির যদি অন্তর্নিহিত একটি অর্থে যাই তাহলে দেখবো যে তা হল "আ" অর্থাৎ ব্যাপক এবং "রতি" অর্থাৎ অনুরাগ বোঝায় এই সীমাহীন অনুরাগ যেখানে থাকে সেখানে সবসময় প্রচলিত রীতি বজায় রেখে বা শাস্ত্রীয় বিধান মানা সম্ভব হয় না। তাই অনেক সময় ভক্ত তাঁর প্রাণের ভক্তির আবর্তনের সঙ্গে শত আবর্তন করেও আরতি করে থাকেন। আসলে কোনো নিয়মই ভক্তির নিবেদনের থেকে বড়ো হতে পারে না।

ধূপ আরাত্রিক বা পঞ্চ উপচার আরতি কোনটিই দীপমালা ছাড়া অসম্পূর্ণ তাই দীপমালা নিবেদনের বিষয়টিও এখানে বলা হচ্ছে। অনেকের মতে দীপ প্রত্যক্ষ অগ্নি তাই নিবেদন আলাদা করে না করেই আরতি করা যায় শুধু গন্ধ পুষ্পে দীপমালাকে অর্চনা করে। কিন্তু যেহেতু আমাদের আলোচনায় কোনো নির্দিষ্ট মত বা বিশ্বাসের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না তাই আরাত্রিক দীপমালা নিবেদন পদ্ধতিটিও বলা হচ্ছে। প্রথমেই "এতস্মৈ/ এতস্যৈ বং প্রজ্জ্বলিত আরাত্রিক দীপমালায়ৈ নমঃ"। এবার "এতে গন্ধ পুষ্পে প্রজ্জ্বলিত আরাত্রিক দীপমালায়ৈ নমঃ"। এবার "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ"। এরপর "এতদ সম্প্রদানায় অমুক দেবায়/ দেব্যৈ নমঃ"। দীপ স্পর্শ করে "ওঁ কাপাসবর্তিসংযুক্তং ঘৃতযুক্তং মনোহরম্। তমোনাশকরং দীপং গৃহাণ পরমেশ্বর/ পরমেশ্বরী।।" দীপ স্পর্শ করে "এষ আরাত্রিক দীপমালায়ৈ অমুক দেবায়/ দেব্যৈ নিবেদয়ামি।" এবার বিধি অনুসারে ও ভক্তির

মিশ্রণে আরতি করতে হবে। এখানে আরেকবার মনে করিয়ে দিই ধূপের আরতির পর দীপ আরতি করা আবশ্যিক যদি তা সম্পূর্ণ নিবেদন মন্ত্র পাঠ না করেও করা হয় তাতে কোনো দোষের নেই। কিন্তু ধুনুচি ধূপ ও পঞ্চদীপই মূল ভাবে আরতিকে সম্পূর্ণ করে। যাঁরা ধূপ আরতি ও সংক্ষিপ্ত আরতি না করে পঞ্চ উপচারে আরতি করতে চান তাঁরা ধূপ ও দীপমালার পর জলপূর্ণ শঙ্খ, পুষ্প, চামর বা আম-বেল-অশ্বথ পত্রগুচ্ছ নিয়ে আরতি করতে পারেন।

আরতি হল নিজের মতো করে নিজের পদ্ধতিতে নিজের হাতে আরাধ্যের আরাধনা। প্রাচীন গ্রন্থে আরতিকে তাই যেমন আরাত্রিক বলা হয়েছে আবার ধূপ আরাধনই ও দীপ আরাধনইও বলা হয়েছে। আরতির জন্য সেই অর্থে আসলে কোনো মন্ত্রের প্রয়োজন নেই যা ব্যবহার করতেই হবে কারণ আরতির মূলমন্ত্রই হল আরাধ্যের প্রতি অহেতুক অন্তরের ভক্তি ভালোবাসার নিবেদন। আরতির শেষে নৈবেদ্য প্রসাদ গ্রহণ করার মতোই প্রসাদী আরতির তাপ আমাদের মাথায় নিয়ে থাকি। এই নিবেদিত আরতির ধূপ দীপের তাপ গ্রহণের কারণ হিসাবে মনে করা হয় যে দেবদেবীর জ্যোতির্ময় তেজ অগ্নিস্বরূপ রায়ুস্বরূপ ধূপ ও দীপের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে, তাই আমরা সেই পবিত্র তেজ জ্যোতিকে আরতি গ্রহণের মাধ্যমে আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করে অসীমের কাছে নমস্কার জানাই। পরিশেষে এটা বলেই শেষ করছি যে আরতি সংক্ষিপ্ত উপচারেই হোক বা বিস্তারিত ভাবে এক্ষেত্রে মন্ত্র বা নিয়মবিধির যত প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় অন্তরের ভালোবাসার। ধূপ ও দীপমালা আরতির মূল উপচার কিন্তু তখনি সম্পূর্ণতা পাবে যখন ধূপের সুগন্ধি ও দীপশিখা ভক্তিধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠবে।